পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ

POULTRY DISEASES & PREVENTION

(বিএজিএড প্রোগ্রামের 'গৃহপালিত পাখির রোগ ও প্রতিকার' নামক বই থেকে সংকলিত)

ডা. আ ন ম আমিনুর রহমান
ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ

সি এল পি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড ঃ **CLP 1206**

(বিএজিএড প্রোগ্রামের গৃহপালিত পাখির রোগ ও প্রতিকার নামক বই থেকে সংকলিত)

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This book is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ

POULTRY DISEASES & PREVENTION

সি এল পি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড ঃ **CLP 1206**

লেখক

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সংকলক

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক

সদস্য

প্রফেসর ড. মোঃ আবু তালেব

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার

মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

ড. মোঃ মোর্শেদুর রহমান

ড. মোঃ বিলাল হোসেন

ড. মোঃ নূরুল ইসলাম

ড. আবু সাদেক মোঃ সেলিম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ

POULTRY DISEASES & PREVENTION

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৮
পুন:প্রকাশ ঃ ২০১১

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
মোঃ মনিরুল ইসলাম

চিত্রাংকন ও আলোকচিত্র
প্রফেসর ড. আ.ন.ম. আমিনুর রহমান

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
তুষার কান্তি মৃধা

মুদ্রণ
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
১৮/২৬/৪, শুকলাল দাস রোড, ঢাকা-১১০০ ।

ISBN 984-34-5056-6

ORIGINAL PUBLICATION

DISEASES OF DOMESTIC BIRDS & THEIR REMEDIES (গৃহপালিত পাখির রোগ ও প্রতিকার), **Written by:** Dr. A N M Aminoor Rahman and Dr. Md. Mostafizur Rahman. **Edited by:** Dr. A N M Aminoor Rahman & Abu Sadeque Md. Selim. **First Edition:** June, 1998. **Published by:** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any means without prior permission of the copyright holder.

সূচিপত্র

ইউনিট ১ পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব **১–১৮**

পাঠ ১.১ পোল্ট্রি উন্নয়নে রোগব্যাধির প্রভাব ১

পাঠ ১.২ রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস ও বিস্তার ৫

পাঠ ১.৩ পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনে করণীয় ১২

ইউনিট ২ পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত রোগ **১৯–৪৪**

পাঠ ২.১ রাণীক্ষেত রোগ ১৯

পাঠ ২.২ বসন্ত রোগ ২৫

পাঠ ২.৩ গামবোরো রোগ ২৯

পাঠ ২.৪ মারেক'স রোগ ৩৩

পাঠ ২.৫ ডাক প্লেগ ৩৭

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৬ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা ৪০

পাঠ ২.৭ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে বসন্তের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা ৪২

ইউনিট ৩ পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ **৪৫-৭২**

পাঠ ৩.১ হাঁসমুরগির কলেরা ৪৫

পাঠ ৩.২ পুলোরাম রোগ ৫০

পাঠ ৩.৩ মুরগির টাইফয়েড রোগ ৫৫

পাঠ ৩.৪ সংক্রামক সর্দি বা করাইজা ৫৯

পাঠ ৩.৫ মাইকোপ্লাজমোসিস ৬৩

ব্যবহারিক

পাঠ ৩.৬ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে কলেরার লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা ৭০

ইউনিট ৪ পোল্ট্রির পরজীবীজনিত রোগ **৭৩-৯৮**

পাঠ ৪.১ দেহাভ্যন্তরের সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ ৭৩

পাঠ ৪.২ বহিঃদেহের সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ ৮০

পাঠ ৪.৩ প্রোটোজোয়াজনিত রোগ ৮৭

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৪ পরীক্ষাগারে মল পরীক্ষা করে কৃমির ডিম শণাক্ত করা ৯৪

পাঠ ৪.৫ পরীক্ষাগারে মল পরীক্ষা করে ককসিডিয়ার উসিস্ট শনাক্ত করা ৯৭

ইউনিট ৫ পোল্ট্রির অপুষ্টিজনিত ও অন্যান্য রোগ **৯৯-১২৮**

পাঠ ৫.১ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ ৯৯
পাঠ ৫.২ খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ ১১৩
পাঠ ৫.৩ ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষক্রিয়াজনিত রোগ ১১৮
পাঠ ৫.৪ মুরগির ক্যানিবালিজম ও ডিম আটকে যাওয়া ১২৩

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৫ আক্রান্ত একটি মুরগি দেখে ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো শণাক্ত করা ও খাতায় লেখা ১২৬

ইউনিট ৬ পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা **১২৯-১৬২**

পাঠ ৬.১ বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণ ও পরিবহণ ১২৯
পাঠ ৬.২ ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার ১৩৪
পাঠ ৬.৩ ভাইরাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার ১৩৮

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪ বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণ করা ১৪৭
পাঠ ৬.৫ নিজ হাতে মুরগি বা হাঁসকে কলেরার টিকা প্রদান ১৪৯
পাঠ ৬.৬ নিজ হাতে একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিকে রাণীক্ষেতের টিকা প্রদান ১৫১
পাঠ ৬.৭ হাঁসকে নিজ হাতে ডাক প্লেগের টিকা প্রদান ১৫৬
পাঠ ৬.৮ হাঁসমুরগির টিকার পরিচিতি ও সিডিউল খাতায় লেখা ১৫৮

তথ্যসূত্র **১৬২**

পাঠ নির্দেশনা

"পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ" কোর্সবইটি বিশেষভাবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল এর সিএলপি প্রোগ্রামের ছাত্রদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনি জানেন, দূর শিক্ষায় শিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। তাই পাঠের কোনো কঠিন বিষয় যেন আপনার বুঝতে অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কোর্সবইটি লেখা হয়েছে। কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা তাই প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কোর্সবইটি আপনাকে নিজে পড়ে বুঝতে হবে, তাই এটি কীভাবে পড়বেন প্রথমেই তা জেনে নিন। এতে কোর্সবইটি পড়তে ও বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

কোর্সবইটির রূপরেখা

"পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ" কোর্সবইটি ছয়টি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে একাধিক পাঠ রয়েছে। পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউনিটের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। ইউনিটের পাঠগুলোকে আলাদা করে সাজানো হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ কোর্সবইটির ইউনিট ১, ২ ও ৩ এর পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন ড. আ ন ম আমিনুর রহমান, অধ্যাপক (সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এবং ইউনিট ৪, ৫ ও ৬ এর পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ।

ইউনিটের ভূমিকা

প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় ইউনিটের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিটটিতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও উল্লেখ রয়েছে। এতে আপনি ইউনিটের শুরুতেই জেনে যাচ্ছেন পাঠের মূল আলোচ্যসূচি কী?

পাঠের উদ্দেশ্য

লক্ষ্য করবেন প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পাঠের বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কি–না তা নিজে নিজেই মূল্যায়ন করবেন। এজন্য পাঠ শেষে স্বমূল্যায়ন প্রশ্ন অর্থ্যাৎ পাঠোত্তর মূল্যায়ন রয়েছে। এতে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পারলেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

আইকনের (Icon) ব্যবহার

পাঠের বিষয়বস্তুগুলো একদৃষ্টিতে বুঝে নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে কোর্সবইটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা আইকন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে আপনি সহজেই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং আপনার করণীয় কী তা বুঝতে পারবেন। নিম্নে এ কোর্সবইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আইকনের অর্থ নির্দেশ করা হলো–

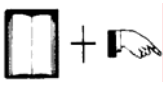 = পড়ুন ও লক্ষ্য করুন

= পাঠের উদ্দেশ্য

= আবশ্যিক পাঠ/সারমর্ম
=

= ছবি দেখুন

= অনুশীলন/চূড়ান্ত মূল্যায়ন

= পাঠোত্তর মূল্যায়ন

= উত্তরমালা

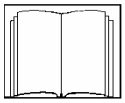 = তথ্যসূত্র

বক্স লিখন

পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় অংশকে আরও আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই "বক্স লিখনের" মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি "বক্স লিখন" মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

অনুশীলন

আপনি পাঠটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন কি–না তা যাচাই করার জন্য পাঠের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় দেয়া রয়েছে অনুশীলন। অনুশীলনগুলো আপনাকে সমাধা করতে হবে। এসব অনুশীলন আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সারমর্ম

প্রতিটি পাঠেই সারমর্ম দেয়া আছে। সারমর্ম পড়ে আপনি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা নিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। পাঠটি ভালোভাবে বোঝার পর পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনার দেয়া উত্তর ইউনিট শেষে দেয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। সবগুলো উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠ শুরু করুন অন্যথায় পাঠটি পুনরায় পড়ুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রতি ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য তথ্যসূত্রের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাথেও কথা বলতে পারেন। ইউনিটের সবগুলো পাঠ ভালোভাবে পড়লে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো সমাধানে কোনো অসুবিধা হবে না।

ইউনিট ১
পোল্ট্রি উৎপাদনে
রোগব্যাধির গুরুত্ব

ইউনিট ১ পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ বুনো পাখিদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখিতে পরিণত করেছে। এসব গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি মানুষকে দিয়েছে উন্নতমানের আমিষ, স্নেহপদার্থ, খণিজ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ ডিম ও মাংস। মানুষ পোল্ট্রির বিভিন্ন উপজাত বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করেছে। এদের পালক দিয়ে সাজিয়েছে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ। লিটারমিশ্রিত মল সার হিসেবে ব্যবহার করেছে। মোটকথা, মানুষের খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোল্ট্রির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের পোল্ট্রির মধ্যে মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস, টার্কি, তিতির ইত্যাদি প্রধান। যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এসব পোল্ট্রি পালন করে আসছে, তথাপি এদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে আধুনিক ব্যবস্থায় সুশৃংখলভাবে পালনের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। বর্তমানে পোল্ট্রি পালন বিশ্বে এক ধরনের শিল্প হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পোল্ট্রি শিল্প নামে খ্যাত এ শিল্প মানুষকে এনে দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও বাংলাদেশে এ শিল্প একেবারেই নতুন, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল। তবে, এখনো এদেশে এ শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পুঁজির অভাব, খাদ্য সমস্যা, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, বিপনন সমস্যা, রোগব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে রোগব্যাধির সমস্যাটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। কাজেই পোল্ট্রি খামার থেকে লাভ পেতে হলে অর্থাৎ পোল্ট্রি থেকে সঠিক উৎপাদন পেতে হলে এদের রোগব্যাধি সম্পর্কে খামারী বা পালনকারীকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। পোল্ট্রি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এসব রোগ পোল্ট্রির উৎপাদন ব্যহত করা ছাড়াও এদের মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোল্ট্রির রোগব্যাধি দূরীকরণে বা দমনে সাধারণত চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি কার্যকরী। তাই খামারকে রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজন উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা এবং পোল্ট্রিকে নিয়মিত টিকাদান।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির প্রভাব, রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস ও বিস্তার এবং রোগব্যাধি প্রতিরোধে সাধারণ করণীয় বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ পোল্ট্রি উন্নয়নে রোগব্যাধির প্রভাব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসমুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগের নাম বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রির ওপর বিভিন্ন রোগের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই পোল্ট্রিকে রোগমুক্ত রাখতে না পারলে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগব্যাধি

রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। পোল্ট্রি খামারে লোকসানের যতগুলো কারণ রয়েছে রোগব্যাধি তার অন্যতম। তাই রোগব্যাধি থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করতে না পারলে খামার থেকে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। পোল্ট্রি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যেমন জীবাণুঘটিত বা সংক্রামক রোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে পুষ্টিহীনতা, বিপাকীয়, বিষক্রিয়া বা ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসংক্রান্ত রোগ অর্থাৎ অসংক্রামক রোগ। সাধারণত বয়স্ক পোল্ট্রির তুলনায় বাচ্চাগুলো রোগব্যাধির প্রতি বেশি সংবেদনশীল। তাই বাচ্চাগুলো সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পোল্ট্রির বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পুলোরাম, করাইজা, যক্ষ্মা,

মাইকোপ্লাজমোসিস, ব্রুডার নিউমোনিয়া, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি প্রধান। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পরজীবীঘটিত রোগ, যেমন– ককসিডিওসিস, বিভিন্ন ধরনের কৃমির আক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবীঘটিত রোগ। অসংক্রামক রোগের মধ্যে অপুষ্টিজনিত, যেমন– নিউট্রিশনাল রোপ, রিকেট, কালর্ড-টো-প্যারালাইসিস, পলিনিউরাইটিস, চিক ডার্মাটাইটিস, এনসেফালোম্যালাসিয়া ইত্যাদি এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসংক্রান্ত রোগের মধ্যে ক্যানিবালিজম, ডিম আটকে যাওয়া, ডিম্বনালি বের হয়ে যাওয়া, হিট স্ট্রেস, স্পর্শজনিত চর্মপ্রদাহ ইত্যাদি অন্যতম।

পোল্ট্রির ওপর রোগব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব

বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোল্ট্রিকে আক্রমণ করে।

পোল্ট্রি থেকে সঠিক হারে উৎপাদন পাওয়ার প্রধান অন্তরায় হলো রোগব্যাধি। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি পোল্ট্রিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে। এতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। কাজেই রোগব্যাধির কারণে পোল্ট্রির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়।

পোল্ট্রি বা হাঁসমুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান।

হাঁসমুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। এগুলো নানাভাবে পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। কিছু কিছু রোগ সরাসরি আক্রমণ করে। আবার কিছু কিছু রোগ, যেমন– স্পাইরোকিটোসিস ও অ্যাভিয়ান ম্যালেরিয়া কীটপতঙ্গ অর্থাৎ ভেক্টরের (Vector) মাধ্যমে ছড়ায়। মুরগির কয়েকটি রোগ, যেমন– ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, পুলোরাম ইত্যাদি ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চায় ছড়ায়। এ রোগগুলো একদিকে যেমন দমন করা কঠিন, অন্যদিকে তেমনি ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন একেবারেই কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এসব রোগে আক্রান্ত মুরগির মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশি।

খামার উন্নয়নে ককসিডিওসিস একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল।

খামার উন্নয়নে প্রোটোজোয়াজনিত ককসিডিওসিস রোগ একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগের ফলে বাচ্চা মুরগির মৃত্যু হার ১৫–২০% এ দাঁড়ায়। কোনো খামারে একবার এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল হয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় এবং রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়।

মুরগির ডিম উৎপাদনে ভাইরাসঘটিত এগ ড্রপ সিন্ড্রোম নামক রোগটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ রোগে আক্রান্ত ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে।

নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান না করলে পোল্ট্রিতে রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

সঠিক সময়ে ও নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান করা না হলে পোল্ট্রিতে ভাইরাসঘটিত রোগ, যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এসব রোগ একবার কোনো এলাকায় বা খামারে মহামারি আকারে দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভাইরাসঘটিত রোগ হওয়ায় এখন পর্যন্ত এগুলোর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। এসব রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে ১০০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে।

এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা।

এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বা সর্দি রোগ বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা। ডিম ফোটানোর যন্ত্র বা ইনকিউবেটর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা না করলে বাচ্চায় ওমফ্যালাইটিস রোগ দমন করা যাবে না। কারণ, এ রোগের জীবাণু *Escherichia coli (ইস্কেরিশিয়া কলাই)* এমনিতেই প্রকৃতিতে অবস্থান করে। ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত ত্রুটির কারণে মুরগি সর্দি বা করাইজা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অত্যধিক ঠান্ডায় এ রোগের জীবাণু মুরগিকে আক্রান্ত করে। এ রোগগুলোর ফলে একদিকে যেমন মুরগির মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে বাড়ন্ত মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় ও উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজ সরবরাহ না করলে এসবের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজপদার্থ সরবরাহ না করলে ভিটামিন ও খণিজের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশে এ সমস্যাটি ব্যাপক। এসব রোগের ফলে মুরগি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায়, উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়।

এদেশে সঠিক নিয়মে খাদ্য সংরক্ষণ করা এক বিরাট সমস্যা। পোল্ট্রির খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে খাদ্যে এক ধরনের ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে। এ ছত্রাক এক ধরনের বিষ উৎপন্ন করে যা খেলে

খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এতে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে।

পোল্ট্রিতে মাইকোটক্সিকোসিস রোগ দেখা দেয়। ফলে এদের ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং মৃত্যুহার অত্যন্ত বেড়ে যায়।

খামারে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব, সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ না করা, মৃত পোল্ট্রি সঠিকভাবে সৎকার না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বিভিন্ন প্রাণী, ধূলিকণা, দুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো ইত্যাদি দায়ী।

পোল্ট্রিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ

নিম্নলিখিত কারণে এদেশে পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। যেমন–

- কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব– এদেশে কোনো কার্যকর পোল্ট্রি নীতি না থাকায় পরিচিতি ছাড়াই অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে রোগাক্রান্ত ডিম, বাচ্চা, মুরগি ইত্যাদি আমদানি হচ্ছে।
- সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণের অভাব– বেশিরভাগ খামারেই সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে এতে নানা রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। তাছাড়া খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমিত মাত্রায় মিশিয়ে সরবরাহ না করলে পাখি রোগাক্রান্ত হয়।
- মৃত পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে কুকুর, শিয়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সেগুলো খায় ও পরিবেশে রোগজীবাণু ছড়ায়।
- ইনকিউবেটর ও হ্যাচারির অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত না করলে এগুলো থেকে ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় রোগ ছড়াতে পারে।
- ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।
- কীটপতঙ্গের মাধ্যমে রোগ ছড়াচ্ছে।
- বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও অনেক রোগের জীবাণু ছড়াচ্ছে।
- দুষিত পানি রোগজীবাণু ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম।
- পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়ায়।
- পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।
- খামারে মানুষ অবাধে চলাফেরা করলে মানুষের জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার মতে এ পাঠে আলোচিত কোন্ রোগটি পোল্ট্রি উৎপাদনে সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলে? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রি উৎপাদনে প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি। এসব রোগব্যাধি সংক্রামক বা অসংক্রামক ধরনের হতে পারে। তবে, যে ধরনেরই হোক না কেন রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি থেকে কখনোই ভালো উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নয়। কিছু কিছু রোগ শুধু উৎপাদনই ব্যহত করে না বরং পোল্ট্রির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু রোগ বাচ্চা পোল্ট্রিকে এবং কিছু কিছু রোগ বয়স্ক পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে। আবার কোনো কোনো রোগ ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চাকে আক্রান্ত করে থাকে। এসব রোগব্যাধির প্রকোপ পোল্ট্রিতে নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন– কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব, সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ না করা, মৃত পোল্ট্রি সঠিকভাবে সৎকার না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বিভিন্ন প্রাণী, ধূলিকণা, দুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. নিউট্রিশনাল রোপ কোন্ ধরনের রোগ?

i) সংক্রামক
ii) অসংক্রামক
iii) অপুষ্টিজনিত
iv) ii ও iii দুটোই

খ. কোন্ রোগটি ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় ছড়ায়?

i) রাণীক্ষেত
ii) এগ ড্রপ সিন্ড্রোম
iii) ফাউল টাইফয়েড
iv) গামবোরো

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ককসিডিওসিস রোগে বাচ্চা মৃত্যু হার ১৫–২০%।
খ. ভিটামিন ও খণিজের অভাবে পাখি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ছত্রাকের বিষের কারণে পোল্ট্রিতে _____ রোগ হয়।
খ. কার্যকর পোল্ট্রি _____ অভাবে অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে পোল্ট্রি আমদানি হচ্ছে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. মৃত পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে কী হয়?
খ. এমন তিনটি রোগের নাম লিখুন যেগুলোর কারণে পোল্ট্রিতে ১০০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে?

পাঠ ১.২ রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস ও বিস্তার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অণুজীব ও রোগজীবাণু কী তা বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রিতে রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর নাম ও প্রকৃতি লিখতে পারবেন।
- কীভাবে এসব জীবাণু পোল্ট্রিতে বিস্তারলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

অণুজীব (গরপৎড়ড়ৎমধহরংসং)

যেসব ক্ষুদ্র জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরকে অণুজীব বলে। যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোপ্লজমা, রিকেটশিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি।

যেসব ক্ষুদ্র জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরকে অণুজীব বলে।

রোগজীবাণু (Pathogen/Pathogenic Microorganisms)

অণুজীবের মধ্যে কোনো কোনোটি রোগ সৃষ্টি করে। আবার কোনো কোনোটি পশু বা পাখিদেহে অবস্থান করলেও কোনো প্রকার রোগ সৃষ্টি করে না। যেসব অণুজীব দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে রোগজীবাণু বলে। এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো এবং এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যেসব অণুজীব দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে রোগজীবাণু বলে।

রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস

রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেখানো হলো–

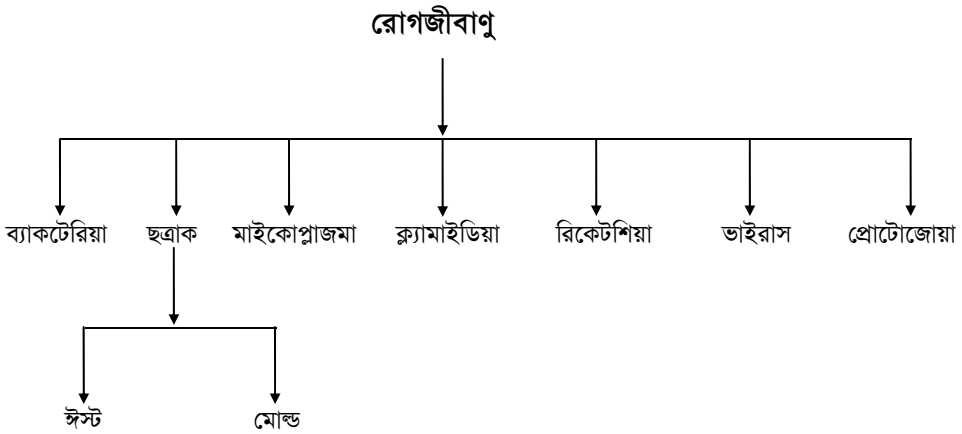

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র এককোষিয় অণুবীক্ষণিক জীবাণু। এদের কোষপ্রাচীর থাকলেও কোনো নিউক্লিও পর্দা নেই। রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া টক্সিন (Toxin) বা বিষ তৈরি করে। ফলে আক্রান্ত পাখিতে রোগলক্ষণ দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়ার আয়তন ০.৪ হতে ১.৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আমরা খালি চোখে ১০০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু সাধারণত দেখি না। নিম্নলিখিতভাবে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন–

ব্যাকটেরিয়া অতি ক্ষুদ্র এককোষিয় অণুবীক্ষণিক জীবাণু যাদের কোষপ্রাচীর থাকলেও কোনো নিউক্লিও পর্দা নেই।

গ্রাম স্টেইনে প্রতিক্রিয়া, অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবৃদ্ধি, আকার-আকৃতি প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১. গ্রাম স্টেইনের প্রতিক্রিয়ার ওপর– গ্রাম স্টেইনে (Gram's Stain) প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– *Streptococcus zooepidemicus (স্ট্রেপটোকক্কাস জুএপিডেমিকাস)* গ্রাম পজেটিভ ও *Escherichia coli* গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া।

২. অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর– অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবৃদ্ধি করতে পারার ওপর এদেরকে সবাত বা অ্যারোবিক (Aerobic) এবং অবাত বা অ্যানেরোবিক (Anaerobic) এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন– *Streptococcus* গণের ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যারোবিক এবং *Chlostridium botulinum (ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম)* ও অন্যান্য Clostridial ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যানেরোবিক।

৩. আকার-আকৃতির ওপর– আকার-আকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. কক্কাস বা কক্কাই (Coccus or Cocci) ঃ এরা দেখতে প্রায় গোলাকার। এরা একাকি, জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ ডিপ্লোকক্কাই (Diplococci), চেইন আকারে অর্থাৎ স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) এবং অনিয়মিত গুচ্ছকারে বা স্টেফাইলোকক্কাই (Staphylococci) হিসেবে থাকতে পারে (চিত্র ১ ক দেখুন)। যেমন– *Streptococcus pyogenes (স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস), Staphylococcus aureus (স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস)* ইত্যাদি।

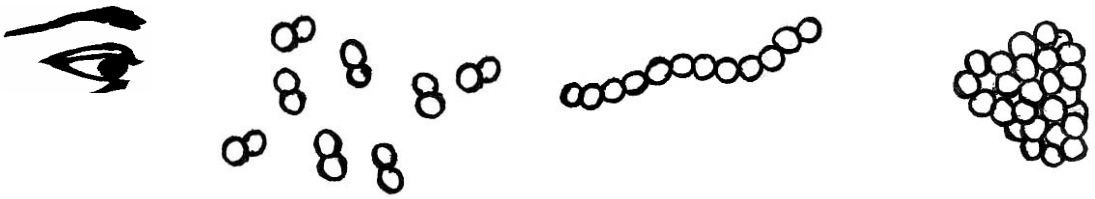

ডিপ্লোকক্কাই স্ট্রেপটোকক্কাই স্টেফাইলোকক্কাই

চিত্র ১ (ক) ঃ বিভিন্ন ধরনের কক্কাই ব্যাকটেরিয়া

খ. ব্যসিলাস বা ব্যাসিলাই (Bacillus or Bacilli) ঃ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ব্যাসিলাস (একবচনে) বা ব্যাসিলাই (বহুবচনে) বলে। যেমন– *Clostridium botulinum, Escherichia coli* ইত্যাদি।

Corynebacterium Spp. *Pasteurella multocida* *Clostridium Spp.*

Bacillus Spp. *Bacillus anthracis*

চিত্র ১ (খ) ঃ বিভিন্ন ধরনের ব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়া

গ. ভিব্রিওস (Vibrios) ঃ এগুলো দেখতে ক্ষুদ্র কমা (comma) আকৃতির। যেমন– *Campylobacter jejuni (ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি)*।

ঘ. স্পাইরোকিটস (Spirochaetes) ঃ এরা দেখতে স্ক্রুর ন্যায় প্যাঁচানো। যেমন– *Borrelia anserina (বরেলিয়া অ্যানসারিনা)*।

ঙ. লেপ্টোস্পাইরা (Leptospira) ঃ এরা দেখতে অনেকটা হিটারের ঢিলা কয়েলের ন্যায়। যেমন– *Leptospira* Spp. (*লেপ্টোস্পাইরা* প্রজাতি)।

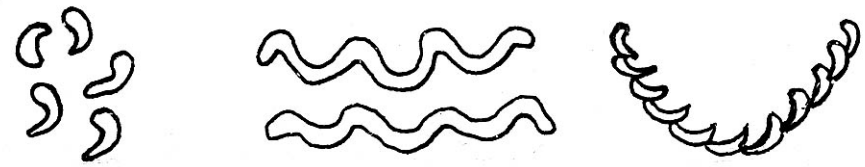

চিত্র ১ (গ) ঃ ভিব্রিওস, স্পাইরোকিটস ও লেপ্টোস্পাইরা

ছত্রাক (Fungus or Fungi)

ছত্রাক এক বা বহুকোষি হতে পারে। এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট, আর বহুকোষিগুলোকে মোল্ড বলে।

এ আদিকোষি জীবাণুটি এককোষি বা বহুকোষি হতে পারে। এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট (Yeast) বলে। আর বহুকোষি ছত্রাকগুলোকে বলে মোল্ড (Mould)। মোল্ডের কোষগুলো সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় ফিলামেন্টের (Filament) সাহায্যে শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করে। প্রতিটি সূত্র হাইফা (Hypha) নামে পরিচিত। একসাথে অনেকগুলো হাইফা মিলে ছত্রাক দেহ বা মাইসেলিয়াম (Mycelium) গঠন করে। প্রতিটি হাইফা আয়তনে ২–১০ মাইক্রোমিটার হতে পারে। ছত্রাকের মধ্যে *Aspergillus fumigatus (অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস), Aspergillus favus (অ্যাসপারজিলাস ফ্যাভাস)* ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

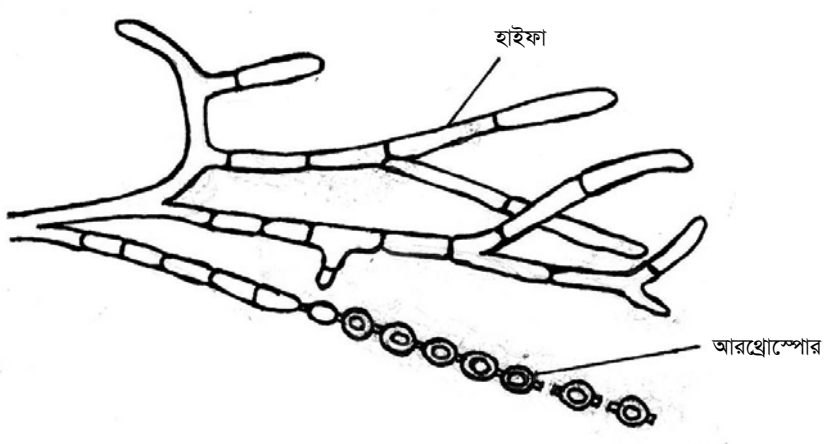

চিত্র ২ ঃ মোল্ড প্রকৃতির ছত্রাক

মাইকোপ্লজমা (Mycoplasma)

মাইকোপ্লাজমা আয়তনে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাঝামাঝি। এদের কোনো কোষপ্রাচীর নেই।

মাইকোপ্লাজমা আয়তনে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাঝামাঝি। এদের আয়তন ০.১৫–১.০ মাইক্রোমিটার হতে পারে। এ জীবাণুর বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোনো কোষপ্রাচীর নেই। তাই এদের বিরুদ্ধে পেনিসিলিন কার্যকরী নয়। তবে, কোষপ্রাচীর না থাকলেও এরা তিন স্তরের প্লাজমা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। *Mycoplasma gallisepticum* (*মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম*), *Mycoplasma synovae* (*মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি*) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মাইকোপ্লজমা জীবাণু।

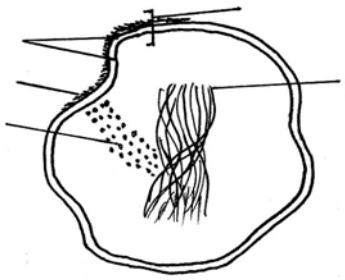

চিত্র ৩ ঃ মাইকোপ্লাজমার দেহের বিভিন্ন অংশ

ক্ল্যামাইডিয়া (Chlamydia)

ক্ল্যামাইডিয়া গোলাকৃতির। এরা কোষের মধ্যে বিস্তারলাভ করে।

ক্ল্যামাইডিয়া দেখতে গোলাকৃতির। পূর্বে এদেরকে ভাইরাস মনে করা হতো। এ অতিক্ষুদ্র জীবাণুটি কোষের মধ্যে (Intracellular) বিস্তারলাভ করে। যেমন– *Chlamydia psittaci (ক্ল্যামাইডিয়া সিটাসি)*।

রিকেটশিয়া (Rickettsia)

পূর্বে রিকেটশিয়াকে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যবর্তী বলে বিবেচনা করা হতো।

এরাও এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যারা কোষের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। এক সময় এদেরকে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যবর্তী বলে বিবেচনা করা হতো। তবে, বর্তমানে এগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। তথাপি এরা ব্যাকটেরিয়া থেকেও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন– *Rickettsia rickettsae (রিকেটশিয়া রিকেটশি), Coxiella burnetti (কক্সিয়েলা বারনেটি)* ইত্যাদি।

ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত অতি অণুবীক্ষণিক বস্তু যা উপযুক্ত পোষকের দেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।

ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত অতি অণুবীক্ষণিক (Ultramicroscopic) বস্তু যা শুধু উপযুক্ত পোষকের (Proper Host) দেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এদের আয়তন মাত্র ০.০১–০.০৩ মাইক্রোমিটার। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ০.২ মাইক্রোমিটারের থেকে ছোট বস্তু দেখা যায় না। তাই ভাইরাস শণাক্তকরণের জন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope) ব্যবহার করতে হয়। পাখির বিভিন্ন ভাইরাসের মধ্যে রাণীক্ষেত রোগ ভাইরাস, মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস, ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাস, ডাক প্লেগ ভাইরাস ইত্যাদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্যারামিক্সোভাইরাস

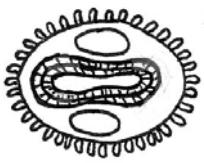

পক্সভাইরাস

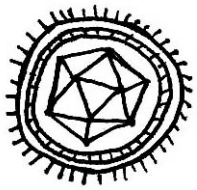

হারপেসভাইরাস

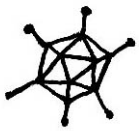

অ্যাডেনোভাইরাস

রিওভাইরাস

চিত্র ৪ ঃ বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস

প্রোটোজোয়া (Protozoa)

প্রোটোজোয়া এককোষি জীব হলেও এদেরকে পরজীবীর সঙ্গেই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

এরা এককোষি জীব। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদেরকে দেখা না গেলেও সাধারণত অণুজীব হিসেবে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক প্রভৃতির সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাস না করে বরং এদেরকে পরজীবীর (Parasite) সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পোল্ট্রির বিভিন্ন প্রোটোজোয়ার মধ্যে ককসিডিয়া, হিস্টোমোনাস, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

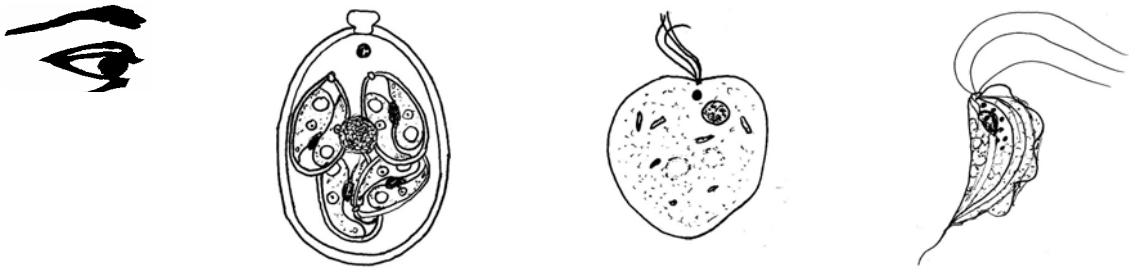

ককসিডিয়া হিস্টোমোনাস ট্রাইকোমোনাস

চিত্র ৫ ঃ পোল্ট্রির বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া

রোগজীবাণুর বিস্তার

পোল্ট্রির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগের উৎস ও বিস্তার জানা একান্ত জরুরি।

রোগজীবাণুর উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে সহজেই যে কোনো জীবাণুঘটি, পরজীবীঘটিত বা অন্যান্য রোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কাজেই পোল্ট্রি খামার ও গ্রাম বা অন্যান্য পোল্ট্রি পালন এলাকায় রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগের উৎস ও বিস্তার জানা একান্ত জরুরি। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জীবাণু ও পরজীবী পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন– বাহক পোল্ট্রি; ডিম; অন্যান্য পশুপাখি; ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকি; কীটপতঙ্গ; বাতাস; খাদ্য ও পানি; লিটার; বিভিন্ন যন্ত্রপাতি; খাদ্য ও পানির পাত্র; বিভিন্ন প্রজাতি ও বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালন; সর্বোপরি মানুষের মাধ্যমে।

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলো পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করতে পারে। যেমন–

- **বাহক পোল্ট্রির মাধ্যমে ঃ** রোগ থেকে সেরে ওঠা পোল্ট্রি অনেক সময় বহুদিন পর্যন্ত সে রোগের জীবাণু বহন করে বেড়ায়। আবার অনেক পোল্ট্রি স্বাভাবিকভাবেও রোগের জীবাণু বহন করতে পারে। এ ধরনের পোল্ট্রি খাদ্য, পানি ও পরিবেশ দুষিত করে সুস্থ পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া এসব বাহক পোল্ট্রি এক খামার থেকে অন্য খামারে বা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। বাহক পোল্ট্রির মাধ্যমে সাধারণত পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, ককসিডিওসিস, হিস্টোমোনিয়াসিস ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে।
- **ডিমের মাধ্যমে ঃ** কোনো কোনো রোগজীবাণু বাহক বা আক্রান্ত পোল্ট্রির ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া এসব জীবাণু কলুষিত মাটি থেকেও ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। এসব জীবাণুযুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর কাজে ব্যবহার করলে ডিমের ভিতরেই বাচ্চার মৃত্যু ঘটে। যেসব বাচ্চা ফুটে বের হয় সেগুলোও বাঁচে না। ডিমের মাধ্যমে পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, মারেক'স প্রভৃতি রোগের জীবাণু বিস্তারলাভ করতে পারে।
- **অন্যান্য পশুপাখির মাধ্যমে ঃ** সঠিকভাবে মৃত পোল্ট্রি সৎকার না করে যত্রতত্র ফেললে বিভিন্ন পশুপাখি, যেমন– কাক, চিল, শকুন, কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি এসব মৃত পোল্ট্রি ভক্ষণ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত বা বাহক বন্য পশুপাখি খামার বা পোল্ট্রি পালন এলাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করলে বা প্রবেশ করলেও বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।
- **ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকির মাধ্যমে ঃ** এসব প্রাণীর মাধ্যমে সহজেই খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। যেমন– *Salmonella (সালমোনেলা)* জীবাণু।

- **কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ঃ** বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, যেমন– মশা, মাছি, ফ্লি, আটালি ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে। যেমন– বসন্ত, মারেক'স, পাইরোপ্লাজমোসিস, লিউকোসাইটোজোনিয়াসিস ইত্যাদি।
- **বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাধ্যমে ঃ** এভাবে বহু রোগের জীবাণু পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে। যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স ইত্যাদি।
- **খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ঃ** রোগজীবাণু স্নারা খাদ্য ও পানি দুষিত হলে সে খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগ ছড়াতে পারে। যেমন– *Salmonella* জীবাণু। আবার খাদ্য ছত্রাক স্নারা দুষিত হলেও পোল্ট্রি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন– অ্যাসপারজিলোসিস, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি।
- **পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমে ঃ** রোগজীবাণু স্নারা লিটার দুষিত হলে সে লিটারে পালিত পোল্ট্রিও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, ককসিডিওসিস ইত্যাদি রোগের জীবাণু লিটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
- **পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমে ঃ** এসবের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- **বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি একত্রে পালন করলে ঃ** বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি একত্রে পালন করা উচিত নয়। কারণ, এতে এক প্রজাতির পোল্ট্রির রোগজীবাণু অন্য প্রজাতির পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। যেমন– মুরগির হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ এভাবে টার্কিতে প্রবেশ করতে পারে।
- **বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালনের মাধ্যমে ঃ** বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালন করলে সহজেই বয়স্ক বাহক পোল্ট্রি থেকে বাচ্চায় রোগজীবাণু ছড়ায়। যেমন– *Salmonella* ও *Eimeria* প্রজাতির জীবাণু বা পরজীবী সহজেই এভাবে বাচ্চা মুরগিতে ছড়ায়।
- **মানুষের মাধ্যমে ঃ** পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষও কম দায়ী নয়। খামারের শ্রমিক, কর্মচারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো প্রভৃতির সাথে রোগজীবাণু লেগে থাকলে কাজ করার সময় বা পরিদর্শনকালে অসাবধানতাবশত এ রোগজীবাণুগুলো খামারের পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে।

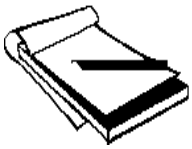

অনুশীলন (Activity) *ঃ পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগজীবাণু বা রোগের নাম ও বিস্তারের মাধ্যম ছক আকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রিকে আক্রান্তকারী রোগজীবাণু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটশিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি। এরা আকার, আকৃতি ও গঠনে একেক রকম হয়ে থাকে। এসব জীবাণুর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া অন্যতম। ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন– গ্রাম স্টেইনে প্রতিক্রিয়া, অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবিস্তার, আকার-আকৃতি প্রভৃতির ওপর। আকার-আকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, দন্ডাকৃতি, কমা, স্ক্রু বা হিটারের কয়েলের ন্যায় প্যাঁচানো প্রভৃতি ধরনের হতে পারে। আবার ছত্রাক হতে পারে এক বা বহুকোষি। প্রোটেজোয়া এককোষি এবং অণুবীক্ষণিক হলেও এদেরকে সাধারণত পরজীবী হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও পরজীবী পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন– বাহক পোল্ট্রি; ডিম; অন্যান্য পশুপাখি; ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকি; কীটপতঙ্গ; বাতাস; খাদ্য ও পানি; লিটার; বিভিন্ন যন্ত্রপাতি; খাদ্য ও পানির পাত্র; বিভিন্ন প্রজাতি ও বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালন; সর্বোপরি মানুষের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গোলাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে কী বলে?

i) কক্কাস
ii) ব্যাসিলাস
iii) ভিব্রিওস
iv) লেপ্টোস্পাইরা

খ. রিকেটশিয়াকে কার অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়?

i) ভাইরাস
ii) প্রোটোজোয়া
iii) মাইকোপ্লজমা
iv) ব্যাকটেরিয়া

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট বলে।
খ. ক্ল্যামাইডিয়া এক প্রজাতির ভাইরাস।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ভাইরাস _____ বস্তু যা শুধু উপযুক্ত পোষকের দেহে বংশবৃদ্ধি করে।
খ. পুলোরাম রোগের জীবাণু _____ মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. যেসব ব্যাকটেরিয়া চেইন আকারে থাকে তাদেরকে কী বলে?
খ. কীটপতঙ্গের মাধ্যমে কোন্ কোন্ রোগ ছড়াতে পারে?

পাঠ ১.৩ পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীব-নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা আলোচনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচী সফল করার উপায় লিখতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে মড়কের সময় করণীয় কাজ বলতে পারবেন।

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়।

পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়। রোগব্যাধি হলে নিরাময়ের জন্য অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু যদি রোগ হওয়ার আগেই এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যাতে রোগই না হয়, অর্থাৎ যদি আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তবে চিকিৎসার কোনো দরকারই পড়বে না। পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, এ অধিক উৎপাদনশীল ছোট্র প্রাণীগুলোর রোগ সারানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করলে অনেকক্ষেত্রেই এরা রোগ থেকে সেরে ওঠে সত্য, কিন্তু রোগসংক্রান্ত পীড়নের ফলে এরপর এদের থেকে আর কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভাইরাসঘটিত রোগের জন্য তো এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয় নি। পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধে খামারী বা পোল্ট্রি পালনকারীর বেশ কিছু করণীয় কাজ আছে। এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলেই পোল্ট্রি খামার রোগমুক্ত থাকবে। কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাবে এবং খামারী তথা দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়

খামারে রোগব্যাধি প্রতিরোধের নিয়মকানুনগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যেক খামারীর একান্ত কর্তব্য।

পোল্ট্রি খামার তা ছোট হোক বা বড় হোক এবং মুরগি, হাঁস বা কোয়েল যে কোনো প্রজাতির জন্যই হোক না কেন খামারে রোগব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কতকগুলো নিয়ম রয়েছে। এগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যেক খামারীর একান্ত কর্তব্য। তবেই খামার হবে রোগমুক্ত। খামারে রোগব্যাধি প্রতিরোধের বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তবে, এগুলোর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– খামারের ভৌগলিক অবস্থান, জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খামারের স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি।

জীব-নিরাপত্তা (Bio-security)

রোগ ও রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি রয়েছে তাদের সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে পোল্ট্রি শিল্পে 'জীব-নিরাপত্তা' বা Bio-security কথাটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে। রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রি রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি আছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রির জীবন রক্ষা করা বা নিরাপত্তাবিধান করা। তবে, যদিও 'জীব-নিরাপত্তা' কথাটি পোল্ট্রি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে তথাপি এ সম্পর্কে অনেক খামারির মধ্যেই বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন হয়তো পোল্ট্রি হাউজের প্রবেশপথ জীবাণুনাশক দিয়ে বা এজাতীয় কিছু টুকটাক ব্যবস্থার মাধ্যমেই পোল্ট্রির 'জীব-নিরাপত্তা' বিধান করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। আসলে জীব-নিরাপত্তা হচ্ছে সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে।

রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠি

নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলোকে পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন–

- পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং অন্য কোনো পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার থেকে যতটা সম্ভব দূরে খামার স্থাপন।

- আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন– আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা। লক্ষণীয় বিষয় হলো এ খাদ্য ও পানি যেন পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধাদানকারী উৎপাদকমুক্ত থাকে।

খামারে কার্যকর নিরোধন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- কার্যকর নিরোধন (Quarantine) ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া খামারের প্রবেশপথে চেক পয়েন্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে করে খামারে কোনো জীবজন্তু বা মানুষের প্রবেশ ও বের হয়ে যাওয়ার ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
- খামারের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ উপযোগী ঘর তৈরি করতে হবে।
- ইঁদুর ও অন্যান্য ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামারকে মুক্ত রাখতে হবে।

খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' পদ্ধতি মেনে চলতে

- খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' (all-in-all-out) পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ খামারের কোনো ঘরে একটি ব্যাচ ঢোকানোর পরে তা বিক্রি না করা পর্যন্ত সে ঘরে আর কোনো নতুন ব্যাচ ঢোকানো যাবে না। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এটি সম্ভব না হলে যত কম রাখা যায় ততই ভালো।
- কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ এলাকায় প্রাপ্ত জীবাণুর সেরোটাইপের (Serotype) ওপর নির্ভর করে করতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন– খালি কার্টন, বাক্স, বোতল, টিকা বা ওষুধের খালি শিশি ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।

খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।

- খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। যেমন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৌতকরণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, ফিউমিগেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে পোল্ট্রি হাউজের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারি ও কর্তাব্যক্তিকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।
- খামারে পেশাগতভাবে যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যে কোনো প্রকার হাতুড়ে লোক খামারের লোকসানের জন্য যথেষ্ট।
- 'জীব-নিরাপত্তা' সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

যে কোনো জীব-নিরাপত্তা কর্মসূচির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর।

এ বারটি উপাদানের সবকয়টি একই সঙ্গে সঠিকভাবে যদি মেনে চলা না যায় তবে যে কোনো পোল্ট্রি খামারীর মহৎ উদ্যোগই ভেস্তে যাবে। যে কোনো 'জীব-নিরাপত্তা' কর্মসূচির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর। আর তা করতে হলে খামারের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাছাড়া এ সম্পর্কে সকলের পর্যাপ্ত জ্ঞানও থাকতে হবে। কোনো জীব-নিরাপত্তা কার্যক্রমে, যেমন– হ্যাচারি বা ব্রুডিং এর জন্য এক ধরনের মানদন্ড আর গ্রোয়িং হাউস বা লেয়িং হাউজের জন্য অন্য এক ধরনের মানদন্ড থাকলে চলবে না। সবক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট মানদন্ড থাকতে হবে।

জীব-নিরাপত্তা বিষয়টি যেহেতু পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা ও এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একত্রে নির্দেশ করে সেহেতু মানুষ জীব-নিরাপত্তা কার্যক্রমের একটি প্রধান অংশ। যেহেতু পোল্ট্রি পালনের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তির সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হওয়ার ওপর জীবাণুঘটিত রোগ হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে সেহেতু পোল্ট্রি খামারের আশেপাশে যারা অবস্থান করবে তাদের সকলকেই সমানভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায়

মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

- অপ্রয়োজনে যে কোনো দর্শনার্থীকে খামারের ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া।

- যেসব দর্শনার্থী অনুমতি সাপেক্ষে খামারে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেকের রেকর্ড রাখতে হবে। যেমন– তাদের পেশা কী, কেন এবং কখন তারা খামারে প্রবেশ করেছিল, তারা ঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছিল কি–না ইত্যাদি।

এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার স্নারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে।

- এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার স্নারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে। অর্থাৎ ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকার মধ্যে ডিভাইডার (Divider) থাকবে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে পরিষ্কার এলাকায় যেতে হলে নিজেকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- যে কোনো বড় খামারের ক্ষেত্রেই গাড়ি পার্কিংয়ের এলাকা, দর্শনণার্থী কক্ষ ইত্যাদিকে ময়লা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার এবং গাড়ি দুটোই ময়লা হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই পোল্ট্রিসামগ্রী বহনকারী গাড়ি, ড্রাইভার এবং পোল্ট্রিম্যানকে পরিষ্কার এলাকাতে ঢুকতে হলে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- দর্শনর্থীর মধ্যে যারা পোল্ট্রি খামারের পরিষ্কার এলাকায় প্রবেশ করবে তাদেরকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। আর পোল্ট্রি হাউজে যেসব পোল্ট্রিম্যান কাজ করতে ঢুকবে তারা অবশ্যই রাবারের জুতো, বিশেষ ধরনের জামা ও মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি পরে ঢুকবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি হাউজের দরজার সামনে জীবাণুনাশক ওষুধ থাকবে যা তাদেরকে মাড়িয়ে যেতে হবে।

খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

ছোটখাট খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। যেমন– খাদ্য ও পানির পাত্র, ডিম সংগ্রহের যন্ত্র, পোল্ট্রি বর্জ সংগ্রহের যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রোগ ছড়ানোর মাধ্যম হওয়ার কারণে এগুলোকে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে ভিতরে ঢোকাতে হবে। আর এগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া খামারের এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। সেকারণেই সম্ভব হলে প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত।

খামারের নিজস্ব পোল্ট্রি বাদে আশেপাশের এলাকার যে কোনো পোল্ট্রি, পোষা পাখি বা প্রাণী এবং বন্যজন্তু রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কাজেই এগুলোকে খামারের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। খামারে অবস্থানরত অনেক কর্মচারিই ব্যক্তিগতভাবে মুরগি বা অন্যান্য পশুপাখি পুষে থাকেন। এগুলো অবশ্যই রোধ করতে হবে। আর এটি করার উৎকৃষ্ট পথ হলো তাদেরকে সস্তায় ডিম ও মাংস সরবরাহ করা।

খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

বন্যজন্তু এবং ইঁদুর যেহেতু পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাই ঘরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদিতে চিকন তারজালির স্ক্রীন লাগিয়ে হাউসে এদের প্রবেশ রোধ করা যায়। তবে, খাদ্য এবং লিটার গুদাম এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা বেশ কষ্টকর। খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাছাড়া পোল্ট্রির ঘরে ব্যবহৃত খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যেখানে সেখানে খাদ্যের উচ্ছিটাংশ ফেললে বা পোল্ট্রি খামারের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার না রাখলে সহজেই ইঁদুর সেখানে বাসা তৈরি করবে, বাচ্চা দেবে, উৎপাত করবে এবং রোগজীবাণু ছড়াবে। কাজেই পুড়িয়ে বা অন্য কোনো উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ পদ্ধতিতে সৎকার করতে হবে। তাছাড়া কম্পোস্ট বা পিট পদ্ধতির মাধ্যমেও এগুলো থেকে উৎকৃষ্টমানের সার তৈরি করা যায়।

স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত।

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্য পালনীয়–

- পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং আশেপাশে অন্য কোনো পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার না থাকলেই ভালো।
- আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন– আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- খামারে বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি পালন না করা।
- বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করা।

বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

- রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহীন পোল্ট্রি সুস্থ পাখিদের থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথক করে ফেলা।
- ডিম ফোটানোর পূর্বে সঠিকভাবে ফিউমিগেশনের মাধ্যমে তা জীবাণুমুক্ত করা।
- খামার থেকে কোনো একটি ব্যাচ বিক্রি করার পর বা ঘর থেকে স্থানান্তর করার পর সেখানে আরেকটি ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে অবশ্যই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এরপর পরবর্তী ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে ঘর কিছুদিন খালি অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত। তাছাড়া খামারের অন্যান্য ঘরদোর, জিনিসপত্র, সরঞ্জামও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না।

- ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণী বা রডেন্ট (Rodents), কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামার মুক্ত রাখতে হবে। এসব প্রাণী খাদ্য নষ্ট করা, খাদ্যে রোগজীবাণুর দুষণ ঘটানো ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। সে কারণে খামারে ইঁদুরের উপস্থিতি জেনে নিয়ে এদের দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে ঘরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পলেস্তরা (Plaster) করতে হবে। তাছাড়া ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কোনো ফাঁকফোকড় না থাকে। খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না। খামার বা শেডে (Shed) সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে বিভিন্ন ধরনের পাখি সহজেই প্রবেশ করবে। তাই ভেন্টিলেটর, জানালা বা অন্যান্য খোলা জায়গায় চিকন তারজালির স্ক্রিন লাগিয়ে খামারে এদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাকে তাকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। যদি কারও প্রবেশের প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। কোনো দর্শনার্থীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে তাকে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়।

মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশেপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের ওপর নির্ভর করে করতে হবে। তাছাড়া সময়মতো কৃমির ওষুধও খাওয়াতে হবে। তবে কোয়েলের ক্ষেত্রে এসবের কোনো দরকার নেই।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ, যেমন– খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, ওষুধ বা টিকার খালি শিশি (Vial) ইত্যাদি গর্ত করে মাটিচাপা দিতে হবে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায়

রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খামারে রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এখানে টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

- টিকা উৎপাদনাকরী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়, ক্রম ও মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

কোনোক্রমেই সময়োর্ত্তীণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

- কোনোক্রমেই সময়োর্ত্তীণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত তাপমাত্রায় বরফসহ ফ্লাক্সে পরিবহণ করাই ভালো।
- সরাসরি সূর্যালোকে মিশ্রণ করলে টিকাবীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সব সময় ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে টিকা মিশ্রণ করতে হবে।
- ৩০°সে. এর অধিক তাপমাত্রায় টিকা প্রদান করা হলে তা সঠিকভাবে কাজ করবে না, তাই দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে অর্থাৎ সকাল ও বিকেলে টিকা প্রদান করা উচিত।
- অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত পোল্ট্রিকে টিকা দেয়া যাবে না।

টিকা গুলতে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভালো।

- মুখের সাহায্যে পানির মাধ্যমে ব্যবহার্য টিকা পানির ভিতর গুলতে হবে।
- ট্যাপের পানিতে জীবাণুনাশক ক্লোরিন থাকায় টিকা গুলতে এ পানি ব্যবহার করা যাবে না। এ কাজে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভালো।
- টিকা গুলতে ধাতব পাত্র ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা ভালো।

- অনেক ওষুধ আছে যেগুলো ব্যবহার করার সময় টিকা দিলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। যেমন– হাইড্রোকর্টিসোন, টেস্টোসটেরন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়াল টিকার ক্ষেত্রে টিকা দেয়ার তিনদিন পূর্ব থেকে তিনদিন পর পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে।

টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

- টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া বা বেঁচে যাওয়া টিকা এবং টিকার খালি বোতল শক্তিশালী জীবাণুনাশক দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে হবে।
- মুখের সাহায্যে ব্যবহার্য টিকা পান করানোর ২–৩ ঘন্টা পূর্বে পানি পান করানো বন্ধ রাখতে হবে যেন মিশ্রিত টিকা দেয়ার পর দ্রুত এরা এগুলো পান করে। অবশ্যই মিশ্রণের দুঘন্টার মধ্যে সমস্ত টিকা পান করাতে হবে।

টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে।

- খাবার পানির সঙ্গে মিশিয়ে টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ মুরগির বয়স, আবহাওয়া এবং লেয়ার বা ব্রয়লার অর্থাৎ মুরগির টাইপের ওপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে।
- টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে।

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়কে করণীয়

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ পাখি থেকে রোগাক্রান্ত পাখি পৃথক করে ফেলতে হবে।

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

- সুস্থ পোল্ট্রি থেকে সত্ত্বর রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি পৃথক করে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পাখির চিকিৎসা ও সুস্থ পোল্ট্রিকে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খামারে দর্শণার্থীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।
- চিকিৎসাতেও যেসব পোল্ট্রি আরোগ্য লাভ করবে না বা রোগ থেকে সেরে ওঠার পরে বাহক পোল্ট্রিতে পরিণত হবে সেগুলোকে মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- রোগজীবাণুর উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূল করতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পোল্ট্রির ঘর, খাঁচা, খাদ্য ও পানির পাত্র এবং অন্যান্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম উপযুক্ত জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।
- সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জন বা পশু চিকিৎসকের পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার মতে খামারে কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়? যুক্তিসহ লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে দমন ও প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। খামারে রোগব্যাধি দমনে বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন– খামারের ভৌগলিক অবস্থান, জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি। রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি রয়েছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে। এটি সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে। মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খামারে রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ পোল্ট্রি থেকে রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি পৃথক করে ফেলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. পোল্ট্রি খামাারে রোগজীবাণু ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম কে?

i) মানুষ
ii) বন্যপ্রাণী
iii) খামারের যন্ত্রপাতি
iv) ইঁদুর

খ. কত তাপমাত্রার উপর টিকা দিলে তা সঠিকভাবে কাজ করবে না?

i) ১০° সে.
ii) ১৫° সে.
iii) ২২° সে.
iv) ৩০° সে.

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. খামারে দর্শনার্থীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।
খ. টিকার সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার করা যায়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. খামারে পর্যাপ্ত _____ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।
খ. _____ সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পোল্ট্রি হাউজে কীভাবে বন্যজন্তু ও ইঁদুরের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
খ. মুরগির রোগপ্রতিরোধে খামারে কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগব্যাধির নাম লিখুন।
২। পোল্ট্রির রোগব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করুন।
৩। বাংলাদেশে পোল্ট্রি উৎপাদনে কোন্ রোগটি প্রধান অন্তরায়? পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ লিখুন।
৪। অণুজীব ও রোগজীবাণু কী? উদাহরণসহ লিখুন।
৫। কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়? সংক্ষেপে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৬। ছত্রাক, মাইকোপ্লজমা ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন।
৭। উদাহরণসহ বাহক পাখি ও ডিমের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণুর বিস্তার আলোচনা করুন।
৮। জীব-নিরাপত্তা কী? কীভাবে পোল্ট্রি খামারে জীব-নিরাপত্তা বিধান করা যায়?
৯। কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মানুষের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াবে না?
১০। কীভাবে পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচী সফল করা যায়?

উত্তরমালা – ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. স. ২। খ. স ৩। ক. মাইকোটক্সিকোসিস ৩। খ. নীতির ৪। ক. পরিবেশে রোগজীবাণু ছড়ায় ৪। খ. রাণীক্ষেত, গামবোরো ও ডাক প্লেগ

পাঠ ১.২

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. অতি অণুবীক্ষণিক ৩। খ. ডিমের ৪। ক. *Streptococcus* ৪। খ. বসন্ত, মারেক'স, মাইকোপ্লাজমোলোসিস, লিউকোসাইটোজোনিয়াসিস ইত্যাদি

পাঠ ১.৩

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. স্বাস্থ্যপ্রদ ৩। খ. জীব-নিরাপত্তা ৪। ক. হাউজের দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটরে চিকন তারজালির স্ক্রীন লাগিয়ে ৪। খ. টিকাদান কর্মসূচি

ইউনিট ২
পোল্ট্রির
ভাইরাসজনিত রোগ

ইউনিট ২ পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত রোগ

পোল্ট্রির জীবাণুঘটিত রোগগুলোর মধ্যে ভাইরাসজনিত রোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাইরাসজনিত রোগের জন্য এ পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের অতি অণুবীক্ষণিক বস্তু যা শুধু পোষকের দেহাভ্যন্তরে বংশবিস্তার করতে সক্ষম। পোষকের দেহের বাইরে সাধারণত এর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। বেশিরভাগ ভাইরাসই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। অথচ, এ ক্ষুদ্র জীবাণুগুলো মানুষসহ গবাদিপশু, পাখি ও বন্যপ্রাণীর, এমনকী উদ্ভিদের, মারাত্মক মারাত্মক রোগের জন্য দায়ী। পোল্ট্রির অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক রোগের কারণ এ অতিক্ষুদ্র ভাইরাস। পোল্ট্রির বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের মধ্যে রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, এগ ড্রপ সিন্ড্রোম, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস, ডাক প্লেগ, ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি প্রধান। এদের আক্রমণে প্রতি বছর বাংলাদেশে বহুসংখ্যক পোল্ট্রি মারা যায়। আর যেগুলো বেঁচে থাকে সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। অনেক সময় এরা রোগের বাহক হিসেবেও কাজ করে। ফলে খামারী তথা দেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়। যেহেতু ভাইরাসজনিত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, তাই আগে থেকে খামারে বা বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থায় পোল্ট্রি পালন করতে হবে এবং এদেরকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হবে। সঠিকভাবে রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারলেই খামারে বা পোল্ট্রি পালন এলাকায় ভাইরাসজনিত রোগ দমন করা যাবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পোল্ট্রির বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ, যেমন– রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ রাণীক্ষেত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রাণীক্ষেত রোগের উৎপত্তি, কারণ ও সংক্রমণ বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত পাখি শণাক্ত করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে ছোঁয়াচে, মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাসজনিত রোগ। এতে শ্বাসনালি, অন্ত্রনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়।

রাণীক্ষেত মুরগির ভাইরাসজনিত তীব্র ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর কমবেশি প্রত্যেক দেশে এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ রোগের ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, মুরগি পালনের জন্য রাণীক্ষেত রোগ একটি প্রধান অন্তরায়। বয়স্ক অপেক্ষা বাচ্চা মুরগি এতে বেশি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়ায়, যেমন– শীত ও বসন্তকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। তবে, বছরের অন্যান্য সময়েও এ রোগ হতে পারে। এ রোগটি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক শহরে শণাক্ত করা হয়। তাই একে নিউক্যাসল ডিজিজ (Newcastle Disease) বলা হয়। তাছাড়া এ উপমহাদেশে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে সর্বপ্রথম এ রোগটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে বলে একে রাণীক্ষেত রোগ বলা হয়। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্ত্রনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই এ রোগকে অ্যাভিয়ান নিউমো-এনসেফালাইটিস (Avian Pneumo-encephalitis) নামেও ডাকা হয়।

রোগের কারণ (Cause)

প্যারামিক্সোভিরিডি (Paramixoviridae) পরিবারের নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাস (Newcastle Disease Virus) নামক এক প্রজাতির প্যারামিক্সোভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ (Disease Transmission)

বাতাস, অসুস্থ পোল্ট্রির সর্দি, কাশি, বন্য পশু, খাদ্য, পানি, লিটার, পরিচর্যাকারির জামা-জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রাণীক্ষেত রোগ ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- বাতাসের মাধ্যমে আক্রান্ত স্থান থেকে অন্যস্থানে জীবাণু ছড়াতে পারে।
- অসুস্থ বা বাহক পাখির সর্দি, কাশি, হাঁচি থেকে সুস্থ পাখিতে এ রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত এবং অতিথি পাখি আমদানির মাধ্যমে।
- মৃত মুরগি বা পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে।
- বন্য পশুপাখির মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শনার্থী মানুষের জামা, জুতো বা খামারের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ (Clinical Signs)

রাণীক্ষেত রোগ পাখিতে তিন প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা– ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক।

এ রোগে প্রধানত শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। এতে তিন প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

ক. ভেলোজেনিক প্রকৃতি (Velogenic Form) ঃ এ প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্মক। এতে অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুত জীবাণু সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যেতে পারে। তবে তা না হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যেমন–

- প্রথমদিকে আক্রান্ত পাখি দলছাড়া হয়ে ঝিমাতে থাকে।
- মাথায় কাপুনি হয়, ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে।
- সাদাটে সবুজ পাতলা পায়খানা করে ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- মুখ হা করে রাখে, কাশতে থাকে এবং নাকমুখ দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- শরীর শুকিয়ে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল কালচে হয় এবং চোখমুখ ফুলে যায়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের খোসা পাতলা ও খসখসে হয়। তাছাড়া অপুষ্ট ডিম উৎপন্ন হয়।

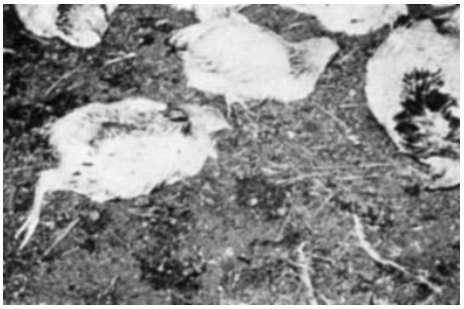

ক– আক্রান্ত মুরগি

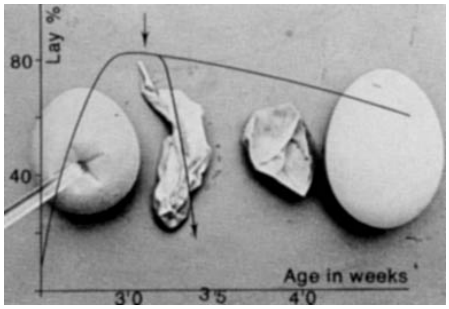

খ– আক্রান্ত মুরগির ডিম

চিত্র ৬ (ক, খ) ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি ও মুরগির ডিম

খ. মেসোজেনিক প্রকৃতি (Mesogenic Form) ঃ এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত মুরগিতে রোগলক্ষণ ততটা তীব্র নয়। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখির কাশি হয় ও মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- হলদে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে।
- জীবাণু আক্রমণের দু'সপ্তাহ পর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ফলে মাথা ঘোরায় ও পা অবশ হয়ে যায়।
- মাথা একপাশে বেঁকে যেতে পারে, কখনো বা মাথা দুপায়ের মাঝখানে চলে আসে অথবা সোজা ঘাড় বরাবর পিছন দিকে বেঁকে যেতে পারে।

চিত্র ৭ ঃ রাণীক্ষেত রোগে মুরগির ঘাড় বেঁকে যায়

গ. লেন্টোজেনিক প্রকৃতি (Lentogenic Form) ঃ এতে মৃদু প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- শ্বাসতন্ত্র কম আক্রান্ত হওয়ায় এ তন্ত্রের লক্ষণ কম প্রকাশ পায়।
- সামান্য কাশি থাকে।
- কিছুটা ক্ষুধামন্দা ভাব থাকে।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ভাইরাস পৃথকীকরণ, ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে রাণীক্ষেত রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে রাণীক্ষেত রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থেকে।
- ভাইরাস পৃথকীকরণ ও শণাক্তকরণের মাধ্যমে।
- শ্বাসনালির নিঃস্রাব, পাখির রক্ত, অস্থিমজ্জা, মস্তিষ্ক, প্লীহা, ফুসফুস প্রভৃতি গবেষণাগারে পরীক্ষা করে।
- মৃত মুরগির ময়না তদন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের রোগতাত্ত্বিক বা প্যাথলজিক্যাল (Pathological Changes) পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো দেখা যায়। যথা–

- শ্বাসনালিতে রক্তাধিক্য ও রক্ত সঞ্চায়ন ।
- স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালিতে রক্তাম্বু বা শ্লৈষ্মিক নিঃস্রাব ।
- প্লীহা বড় হয়ে যায় ।
- খাদ্য অন্ত্রে, বিশেষ করে প্রোভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে, রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত (Haemorrhagic Necrotic Foci) ।
- অন্ত্রের শেষভাগে পাতলা সাদাটে মল ।

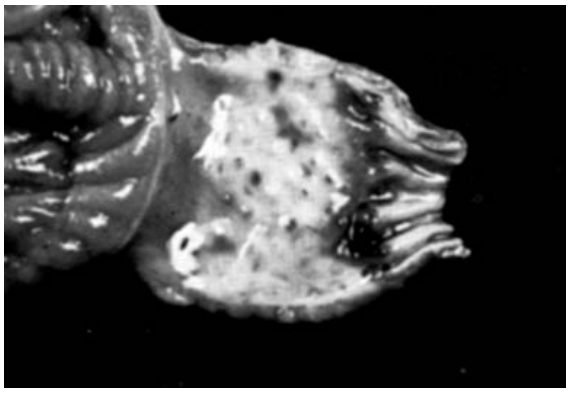

চিত্র ৮ ঃ প্রোভেন্ট্রিকুলাস ও গিজার্ডে রক্তক্ষরিত পচা ক্ষত

চিকিৎসা (Treatment)

রানীক্ষেত রোগের কোনো চিকিৎসা নেই ।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই । তবে, আক্রান্ত পাখিতে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে । এছাড়াও ০.০১% পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানির সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত পাখিকে দৈনিক ২/৩ বার খাওয়ানো যেতে পারে ।

রোগপ্রতিরোধ (Prevention)

রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধের জন্য এদেশে দুধরনের টিকা তৈরি হয় । যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি. । এছাড়াও বিদেশ থেকে টিকা আমদানি করা হয় ।

প্রতিরোধই এ রোগ দূরীকরণের একমাত্র উপায় । তাই সময়মতো পাখিদের টিকাদান করতে হবে । বাংলাদেশে রাণীক্ষেত রোগের দুধরনের টিকা প্রস্তুত হয় । যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি. ।

বি.সি.আর.ডি.ভি (BCRDV– Baby Chick Ranikhet Disease Vaccine) ঃ এ টিকাবীজের প্রতিটি শিশি বা ভায়ালে (Vial) হিম শুষ্ক অবস্থায় ১ মি.লি. মূল টিকাবীজ থাকে । প্রতিটি শিশির টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিস্রুত পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হয় । এরপর ৭ দিন ও ২১ দিন বয়সের প্রতিটি বাচ্চা মুরগির এক চোখে এক ফোটা করে ড্রপারের সাহায্যে দিতে হয় । প্রতিটি সবুজ রঙের শিশিতে ১০০ মাত্রার টিকা থাকে ।

আর.ডি.ভি. (RDV– Ranikhet Disease Vaccine) ঃ এ টিকাবীজের প্রতিটি ভায়ালে ০.৩ মি.লি. মূল টিকাবীজ হিম শুষ্ক অবস্থায় থাকে । এ টিকা দুমাসের অধিক বয়সের মুরগির জন্য উপযোগী । প্রথমে ভায়ালের টিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিস্রুত পানির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । এরপর তা থেকে ১ মি.লি. করে নিয়ে প্রতিটি মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে । ছয় মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে । প্রতিটি সাদা রঙের শিশিতে ১০০ মাত্রার টিকাবীজ থাকে । এছাড়াও বিদেশ থেকে রাণীক্ষেত রোগের বিভিন্ন টিকা আমদানি করা হয় । যেমন– নবিলিস এন ডি ক্লোন ৩০, নবিলিস এন ডি ল্যাসোটা, নবিলিস এন ডি হিচনার (ইন্টারভেট) । এগুলো কোম্পানির নির্দেশমতো প্রয়োগ করতে হবে ।

টিকা ছাড়াও খামার থেকে এ রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা–

- রাণীক্ষেত রোগে মৃত পাখিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটিচাপা দিতে হবে।
- খামারের যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন– আয়োসান, সুপারসেপ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায়) দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার মতে কোনো খামারে রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? যুক্তিসহ লিখুন।*

সারমর্ম ঃ রাণীক্ষেত রোগ বা নিউক্যাসল ডিজিজ মুরগির ভাইরাসজনিত একটি তীব্র প্রকৃতির ছোঁয়াচে রোগ। পৃথিবীর সবদেশেই এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্ত্রনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। এ রোগে পাখিতে তিন প্রকৃতির রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা– ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক প্রকৃতি। এ রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। কাজেই প্রতিরোধই রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ। এ রোগ প্রতিরোধে বাংলাদেশে দুধরনের টিকাবীজ তৈরি হয়। যথা– বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.। এছাড়াও বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাণীক্ষেত টিকা আমদানি করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. রাণীক্ষেত রোগ সর্বপ্রথম কোথায় শণাক্ত করা হয়?

i) বাংলাদেশের সাভারে
ii) ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলে
iii) ভারতের রাণীক্ষেতে
iv) পাকিস্তানের লাহোরে

খ. রাণীক্ষেত রোগে মুরগির কোন্ কোন্ তন্ত্র আক্রান্ত হয়?

i) শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র
ii) শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও জননতন্ত্র
iii) শ্বাসতন্ত্র, জননতন্ত্র ও মূত্রতন্ত্র
iv) শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্র

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. রাণীক্ষেত রোগ একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।
খ. রাণীক্ষেত রোগ খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. রাণীক্ষেত রোগকে অ্যাভিয়ান _____ নামেও ডাকা হয়।
খ. ভেলোজেনিক প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগে মুরগি _____ সবুজ পাতলা পায়খানা করে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বিভিন্ন প্রকৃতির রাণীক্ষেত রোগের নাম লিখুন।
খ. বাংলাদেশে তৈরি রাণীক্ষেত রোগের টিকাগুলোর নাম লিখুন।

পাঠ ২.২ বসন্ত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির বসন্ত রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- বসন্তের কারণ ও সংক্রমণ লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকৃতির বসন্তের নাম লিখতে পারবেন ও এগুলোর লক্ষণ আলোচনা করতে পারবেন।
- বসন্ত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

পোল্ট্রির বসন্ত ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও সব প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে।

পোল্ট্রির বসন্ত বা ফাউল পক্স (Fowl Pox) একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সের ও সব প্রজাতির পোল্ট্রি এতে আক্রান্ত হতে পারে। পোল্ট্রির বসন্ত একটি মারাত্মক রোগ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এ রোগের সঙ্গে পরিচিত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মৃত্যুহার অত্যন্ত বেড়ে যায়। যদিও ফাউল পক্স বলতে সব পোল্ট্রির বসন্ত রেগকেই বুঝায় তথাপি বর্তমানে আলাদা নামেও, যেমন– পিজিয়ন পক্স, টার্কি পক্স, ক্যানারি পক্স প্রভৃতি ডাকা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব পোল্ট্রি উৎপাদনকারী দেশেই বসন্ত রোগ দেখা যায়। এ রোগে পাখির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত উন্মুক্ত স্থানে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে নডিউল (Nodule) সৃষ্টি হয় যা বসন্তের গুটি নামে পরিচিত।

রোগের কারণ

পক্সভিরিডি (Poxviridae) পরিবারের ফাউল পক্স ভাইরাস (Fowl Pox Virus) নামক ভাইরাস বসন্ত রোগের কারণ।

সংক্রমণ

রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, ত্বকের ক্ষত, ঈষধী ও অবফবং মশা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের কামড়ের মাধ্যমে বসন্ত রোগ সংক্রমিত হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। যথা–

- রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে সুস্থ পাখিতে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- ত্বকের ক্ষত বা কাটা ছেঁড়ার মাধ্যমে।
- *Culex (কিউলেক্স)* ও *Aedes* (*অ্যাডিস*) মশা এবং দংশনকারী কীটপতঙ্গের মাধ্যমে।
- তাছাড়া কখনো কখনো রক্তশোষক মাছি, ফ্লি ও আটালির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ

বসন্ত রোগ প্রধানত ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতিতে দেখা যায়। এগুলো আবার মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

বসন্ত রোগ প্রধানত দু'প্রকৃতিতে দেখা যায়। যথা–

ক. ত্বকীয় বা হেড ফর্ম (Cutaneous or Head Form) ঃ এ প্রকৃতিতে আক্রান্ত পাখির মুখমন্ডলে বসন্তের গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটিকে শুষ্ক বসন্তও (Dry Pox) বলা হয়।

খ. ডিপথেরিটিক প্রকৃতি (Diptheritic Form) ঃ এ প্রকৃতিতে প্রথমে আক্রান্ত পাখির জিহ্বায় ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষত পরে শ্বাসনালি ও ফুসফুসে বিস্তারলাভ করে। অপ্রধান জীবাণুর জটিলতায় অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণে অবশেষে পাখির মৃত্যু ঘটে। এ প্রকৃতির বসন্ত আর্দ্র বসন্ত (Wet Pox) নামেও পরিচিত।

ক– ত্বকীয় প্রকৃতির বসন্ত

খ– ডিপথেরিটিক প্রকৃতির বসন্ত

চিত্র ৯ (ক, খ) ঃ ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতির বসন্তে আক্রান্ত মুরগির ক্ষত

এ দু'প্রকৃতির বসন্ত আবার পাখিতে মৃদু ও তীব্র আকারে রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যেমন–

মৃদু প্রকৃতির বসন্তে–

- পাখির উন্মুক্ত ত্বকে বসন্তের ফোস্কা দেখা যায়। এটিই এ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- মুরগির ঝুঁটি, গলকম্বল, পা, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ুর চারপাশে বসন্তের গুটি বা ফুসকুঁড়ি দেখা যায়। এগুলো কিছুটা কালচে বাদামি রঙের হয়।
- চোখের চারপাশে বসন্তের ফুসকুঁড়ির ফলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

তীব্র প্রকৃতির বসন্তে–

- দেহের মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রের দেয়ালেও বসন্তের ক্ষত দেখা দিতে পারে।
- শ্বাসনালি আক্রান্তের ফলে পাখির শ্বাসকষ্ট হয় ও পাখি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।
- এতে ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- এতে পাখির মৃত্যুহার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে পাখিতে বসন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- মুরগির আক্রান্ত স্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা–
  - ♦ আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল দাগ হয়।
  - ♦ পরবর্তীতে যা বড় হয়ে পুঁজপূর্ণ হয় ও পেঁকে ঘা সৃষ্টি করে। এ ঘায়ে শেষে মামড়ি সৃষ্টি হয় ও তা পরবর্তীতে খসে পড়ে।
- আক্রান্ত পাখির ক্ষতের নমুনা সুস্থ পাখির ঝুঁটি বা পালকের ফলিকুলে আঁচড়িয়ে প্রবেশ করিয়ে উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুটি দেখে।

চিকিৎসা

বসন্ত রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই।

এ রোগের কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। তবে আক্রান্ত ক্ষত জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন– মারকিউরিকক্রোম) দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে সকেটিল, সালফানিলামাইড বা অন্য কোনো

জীবাণুনাশক পাউডার লাগালে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ রোধ করতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ

বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পোল্ট্রির টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি।

রোগপ্রতিরোধের জন্য যথাসময়ে পোল্ট্রির টিকা প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি এবং মশা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। রোগ থেকে আরোগ্য লাভকারী পাখিতে আজীবনের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। বসন্ত প্রতিরোধের জন্য এ দেশে দু'ধরনের টিকা প্রয়োগ করা হয়। যথা–

১. পিজিয়ন পক্স টিকা ঃ এটি ৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানির সাথে মিশিয়ে দু'সপ্তাহের বাচ্চার ডানার পালকবিহীন অংশে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল (Biforked Priking Needle) বা সুচ দিয়ে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করা হয়।

২. ফাউল পক্স টিকা ঃ এ টিকা হিমশুষ্ক অবস্থায় ০.৩ মি.লি. মাত্রায় কাচের অ্যাম্পুলে থাকে। এ পরিমাণ টিকা পরিস্রুত পানিতে মিশিয়ে দু'শ পাখিতে প্রয়োগ করা যায়। পিজিয়ন পক্স টিকার মতো এ টিকাও একই পদ্ধতিতে বাইফর্কড প্রিকিং নিডল দিয়ে পাখির ডানার পালকবিহীন স্থানে তিনবার বিদ্ধ করতে হবে। প্রতিবারই পরিস্রুত পানিতে গুলানো টিকায় নিডল চুবিয়ে নিতে হবে। এ টিকা প্রয়োগের ৫, ৭ ও ১০তম দিনে টিকাবিদ্ধ স্থানে বসন্তের গুটি দেখা গেলে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। এ টিকা একমাসের বেশি বয়সের পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বিদেশে প্রস্তুত বসন্ত রোগের টিকা পাওয়া যায়। যেমন– ওভোডিপথেরিন ফোর্ট (ইন্টারভেট) যা কোম্পানির নির্দেশমতো মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। বছরে একবার পাখিতে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়।

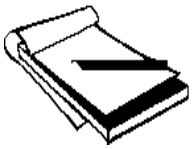

অনুশীলন (Activity) ঃ *মুরগির রাণীক্ষেত ও বসন্তের লক্ষণগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ছক আকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও প্রজাতির পোল্ট্রি এতে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যুহার হতে পারে। এ রোগে পোল্ট্রির দেহের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পালকবিহীন স্থানে এবং মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, অন্ত্র প্রভৃতিতে বসন্তের গুটি দেখা যায়। রোগাক্রান্ত পাখি স্পর্শে, ত্বকের ক্ষতের মাধ্যমে এবং কীটপতঙ্গ, যেমন– মশা, মাছি, ফ্লি, আটালি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। বসন্ত রোগ ত্বকীয় ও ডিপথেরিটিক প্রকৃতির হতে পারে। এ রোগের লক্ষণ মৃদু এবং তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, মশামাছি ধ্বংস ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বসন্তের বিরুদ্ধে এদেশে পিজিয়ন পক্স ও ফাউল পক্স টিকা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও বাজারে বিদেশে প্রস্তুত টিকা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্ কোন্ প্রজাতির মশার মাধ্যমে পোল্ট্রির বসন্ত রোগ ছড়ায়?

i) *Culex* ও *Anopheles*
ii) *Aedes* ও *Anopheles*
iii) *Culex* ও *Aedes*
iv) কোনোটিই নয়

খ. তীব্র প্রকৃতির বসন্তে কত % পর্যন্ত পোল্ট্রি মারা যেতে পারে?

i) ৩০%
ii) ৩৮%
iii) ৪৫%
iv) ৫০%

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. শ্বাসনালি আক্রান্ত হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পোল্ট্রি মারা যেতে পারে।
খ. বসন্তের গুটি প্রথমে ছোট লাল দাগ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ প্রিকিং নিডলের মাধ্যমে বসন্তের টিকা দেয়া হয়।
খ. ফাউল পক্স টিকা _____ অধিক বয়সের মুরগিতে দিতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বসন্ত রোগ কয় প্রকৃতির হতে পারে? নাম লিখুন।
খ. এদেশে ব্যবহৃত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকাগুলোর নাম লিখুন।

পাঠ ২.৩ গামবোরো রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গামবোরো রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- গামবোরো রোগের কারণ, সংক্রমণ ও লক্ষণ লিখতে পারবেন।
- গামবোরো রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এতে পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ আক্রান্ত হয় বলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। একে বার্ড এইডসও বলে।

গামবোরো বাচ্চা মুরগির মারাত্মক সংক্রামক রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। এ রোগে পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ অর্থাৎ বার্সা অভ্ ফ্যাব্রিসিয়াস (Bursa of Fabricius) আক্রান্ত হয় বলে রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা সহজেই অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এ রোগকে বার্ড এইডস বা পোল্ট্রি এইডসও (Bird AIDS or Poultry AIDS) বলা হয়। এ রোগটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের দেলওয়ার অঙ্গরাজ্যের গামবোরো জেলায় শণাক্ত করা হয় বলে একে গামবোরো রোগ বলে। কিন্তু এর মূল নাম ইনফেকশাস বার্সাইটিস (Infectious Bursitis) বা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ (Infectious Bursal Disease)। এ রোগে সাধারণত ২–৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্তের হার খুব বেশি (১০০% পর্যন্ত), তবে মৃত্যুহার কম (৫–১৫%)। তবে, কোনো কোনো সময় আক্রান্ত বাচ্চার ৫০%ও মারা যেতে পারে। এ রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কমে যায়।

রোগের কারণ

বিরনাভিরিডি (Birnaviridae) পরিবারের অর্ন্তগত বিরনা ভাইরাসের সেরোটাইপ ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসের দু'টো স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন– ক্ল্যাসিক্যাল (Classical) ও ভ্যারিয়্যান্ট (Varient) স্ট্রেইন।

সংক্রমণ

আক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, বাতাস, কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি, খাদ্য, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো প্রভৃতির মাধ্যমে গামবোরো রোগ ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- একই ঘরে রাখা অসুস্থ বাচ্চার সংস্পর্শে সুস্থ বাচ্চা এলে।
- বাতাসের মাধ্যমে।
- কলুষিত লিটার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
- খাদ্য এবং লিটারের পোকামাকড়ের মাধ্যমে।
- পরিচর্যাকারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে।

লক্ষণ

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে ক্ষুধামন্দা, পালক উসকোখুশকো হওয়া, সাদা ও আঠালো পাতলা পায়খানা হওয়া যা মলদ্বারের চারদিকে লেগে থাকে, পানিশূন্যতা, শুকিয়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

গামবোরো রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ক্ষুধামন্দা।
- পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।
- সাদা রঙের শ্লেষ্মাযুক্ত মল ত্যাগ করে, মলে রক্ত থাকতে পারে। এ মল মলদ্বারের চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে।
- প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও পরে তা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে আসে।
- পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার কারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়।
- পাখি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শরীরের সতেজতা নষ্ট হয়।
- তীব্র রোগে পোল্ট্রির শরীরে কাঁপুনি হয় ও অবশেষে পোল্ট্রি মারা যায়।

- বেঁচে যাওয়া পাখির দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ।
- বাচ্চাগুলো একসঙ্গে ব্রুডার বা ঘরের এককোণে জড়ো হয়ে থাকে ।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে গামবোরো রোগ শণাক্ত করা যায় ।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায় । যেমন–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে ।
- মৃত বাচ্চার ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে । এতে–
  - থাইমাস এবং বার্সা ফুলে যায় ও তাতে রক্তের ছিটা পাওয়া যায় ।
  - পা এবং উরুর মাংসে রক্তের বড় বড় ছিটা দেখা দেয় ।

চিত্র ১০ ঃ গামবোরো রোগে আক্রান্ত বাচ্চা মুরগি

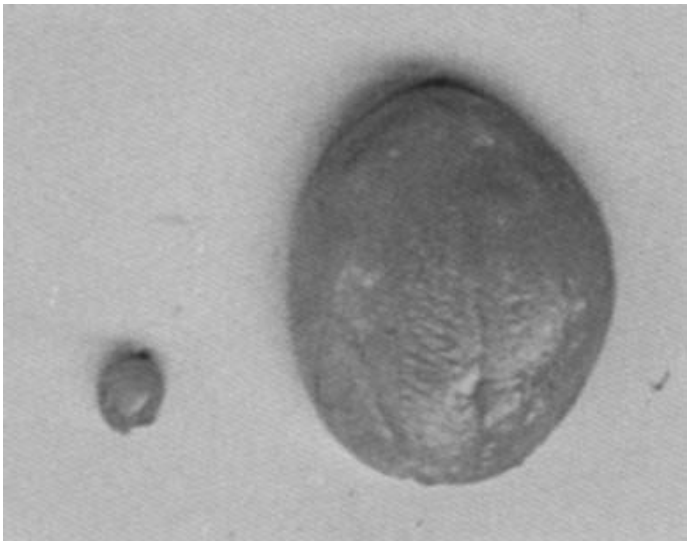

চিত্র ১১ ঃ সুস্থ পাখির বার্সা (বামে) ও গামবোরো রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রির ফোলা বার্সা (ডানে)

চিকিৎসা

আক্রান্ত পোল্ট্রিগুলোকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি পান করালে পানিশূন্যতা রোধ হয়।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পোল্ট্রিগুলোকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি (৫ লিটার পানি + ২৫০ গ্রাম আঁখের গুড় + ১০০ গ্রাম লবণ) পান করালে এদের পানিশূন্যতা রোধ হয়। এরা গায়ে শক্তি পায় এবং রক্তপড়া বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া ৫০০ মি.গ্রা. অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রতি ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে পরপর ৩ দিন খাওয়ালে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

গামবোরা রোগ প্রতিরোধের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের টিকা পাওয়া যায়।

প্রতিরোধই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পন্থা। এজন্য খামারে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ঘরদোর, খাঁচা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক, যেমন– ফরমালিন (ফরমালিন ঃ পানি = ১ ঃ ৯), আয়োসান বা সুপারসেপ্ট দিয়ে ধৌত করতে হবে। এতে গামবোরোর জীবাণু মারা পড়বে। এদেশে গামবোরের বেশ কয়েক ধরনের টিকা আমদানি করা হয়। যেমন– নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ (Nobilis Gumboro D 78), VI বার্সা জি (VI Bursa G), বার ৭০৬ (Bur 706), গামবোরাল সিটি (Gumboral CT) ইত্যাদি। এগুলো প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় নির্দিষ্ট বয়সে পাখিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, ১৪–১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪–২৮ দিন বয়সে বুস্টার হিসেবে চোখে ড্রপ বা মুখের মাধ্যমে পান করিয়ে এ টিকা প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ পোল্ট্রি খামারে গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খামারীকে আপনি কী পরামর্শ দেবেন?*

সারমর্ম ঃ গামবোরো বা ইনফেকশাস বার্সাইটিস বাচ্চা মুরগির একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এ রোগকে পোল্ট্রি এইডস বলে। এ রোগে আক্রান্তের হার অত্যন্ত বেশি (১০০%), কিন্তু মৃত্যু হার কম (৫–১৫%)। গামবোরো রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে ক্ষুধামন্দা, পালক উসকোখুশকো হওয়া, সাদা ও আঠালো পাতলা হওয়া পায়খানা হওয়া (যা মলদ্বারের চারদিকে লেগে থাকে), পানিশূন্যতা, শুকিয়ে যাওয়া, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। তীব্র অবস্থায় কাঁপুনি দিয়ে পাখি মারা যায়। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, আক্রান্ত পাখিকে ৩–৫ দিন স্যালাইন পানি পান করালে পানিশূন্যতা রোধ হয়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের টিকা পাওয়া যায়। সাধারণত ১৪–১৮ দিন বয়সে প্রথমবার ও ২৪–২৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ হিসেবে টিকা প্রদান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গামবোরো রোগের ভাইরাস কোন্ পরিবারের অন্তভূর্ক্ত?

i) বিরনাভিরিডি
ii) পক্সভিরিডি
iii) প্যারামিক্সোভিরিডি
iv) রেট্রোভিরিডি

খ. কোন্‌টি গামবোরো রোগের টিকা?

i) গামবোরাল সিটি
ii) বার ৭০৬
iii) ডি ৭৮
iv) উপরের সবগুলোই

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গামবোরো রোগকে বার্ড এইডস বলে।
খ. গামবোরো আক্রান্ত পাখিকে স্যালাইন পান করানো নিষেধ।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গামবোরো রোগ সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের _____ অঙ্গরাজ্যে শণাক্ত করা হয়।
খ. গামাবোরো রোগাক্রান্ত পাখির বার্সা _____ যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পাখির রোগপ্রতিরোধক অঙ্গের নাম কী?
খ. গামবোরো রোগের টিকা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ২.৪ মারেক'স রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মারেক'স রোগ কী ও এর কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মারেক'স রোগ সংক্রমণ, রোগের লক্ষণ ও রোগ নির্ণয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে মারেক'স রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মারেক'স পোল্ট্রির স্নায়ুতন্ত্রের ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ।

মারেক'স রোগ (Marek's Disease) পোল্ট্রির স্নায়ুতন্ত্রের টিউমার সৃষ্টিকারী মারাত্মক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এটি লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ রোগ (Lymphoproliferative Disease) যা পাখির ক্যানসার। এ রোগে পাখির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, যৌন গ্রন্থি, চোখের আইরিস, পেশি ও ত্বক আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৬–১০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম হাঙ্গেরিতে মারেক (Marek) নামে এক ব্যক্তি এ রোগটি আবিষ্কার করেন বলে তার নামানুসারে এ রোগের এরূপ নামকরণ করা হয়। অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে একে ফাউল প্যারালাইসিসও (Fowl Paralysis) বলে।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি (Herpesviridae) পরিবারের অন্তর্গত হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস (MDV) নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ

বাতাস, খাদ্যের ব্যাগ, আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল ইত্যাদির মাধ্যমে মারেক'স রোগ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

- বাতাসের সাহায্যে জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে।
- খাদ্যের ব্যাগ বা বস্তা, যন্ত্রপাতি, জামা-জুতা ইত্যাদির মাধ্যমে।
- আক্রান্ত পাখির লালা, শ্লেষ্মা, মল, পাখার ফলিকুল বা গোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে।
- কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে, ডার্কলিং বিটলের (Darkling Beetle) মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

অবশতা মারেক'স রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর লক্ষণ নির্ভরশীল।

অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত পাখির জাত, বয়স ও ভাইরাসের স্ট্রেইনের ওপর এ রোগের লক্ষণ নির্ভর করে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- প্রান্তীয় স্নায়ু আক্রান্তের ফলে এক পা, এক ডানা বা দুই পা, দুই ডানা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ে।

চিত্র ১২ ঃ মারেক'স রোগে আক্রান্ত মুরগি

- ঘাড়ের মাংসপেশি আক্রান্ত হলে মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।
- আইরিস বা চোখের উপতারা আক্রান্ত হলে পাখিতে অন্ধত্ব দেখা দেয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে–

- ক্ষুধামন্দা দেখা যায়।
- ফ্যাকাশে দেখায়।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- পাখি খোঁড়ায় ও পা, ডানা ইত্যাদি অবশ হয়ে যায়।
- হা করে নিঃশ্বাস নেয়।
- অনাহার ও পানিশূন্যতার কারণে পাখি মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে মারেক'স রোগ নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যেমন–

  আক্রান্ত পাখির–

  - ♦ বার্সা ও থাইমাস ছোট হয়ে যাবে।
  - ♦ প্রান্তীয় স্নায়ু, যেমন– সায়াটিক স্নায়ু মোটা হবে।
  - ♦ যে কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গে এবং পাখার ফলিফুল বা গোড়ায় টিউমার হবে।
  - ♦ চোখের আইরিসের বর্ণের বিকৃতি ঘটবে।

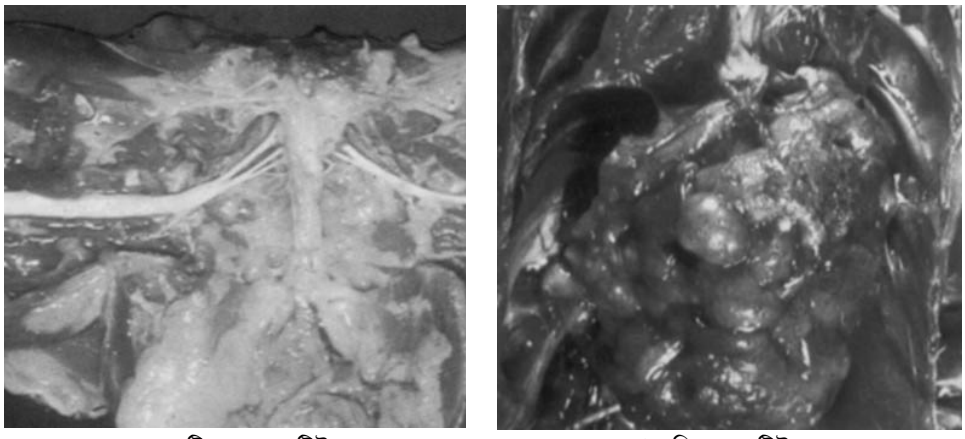

ক– সায়াটিক স্নায়ুতে টিউমার খ– ডিম্বাশয়ে টিউমার

চিত্র ১৩ (ক, খ) ঃ মারেক'স রোগে আক্রান্ত পাখির সায়াটিক স্নায়ু ও ডিম্বাশয়ে টিউমার

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও রোগপ্রতিরোধ

মারেক'স রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন–

- স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থায় খামার পরিচালনা করা।

- বিভিন্ন বয়সের মুরগি বা কোয়েল আলাদা আলাদা পালন করা।
- আক্রান্ত পাখি সুস্থ পাখি থেকে দূরে রাখা।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- সুস্থ মুরগির বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের হচ্ছে বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগে করা সর্বোত্তম পন্থা।

মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বাচ্চা মুরগিতে টিকা প্রয়োগ করা সর্বোত্তম পন্থা। যে কোনো ধরনের সংহারী টিউমার বা ক্যানসারের বিরুদ্ধে এটি প্রথম উদ্ভাবিত টিকা। বাংলাদেশে মারেক'স রোগের টিকা প্রস্তুত হয় না। তবে, বাজারে আমদানি করা টিকা কিনতে পাওয়া যায়। মারেক'স রোগের বিভিন্ন ধরনের টিকা রয়েছে। তবে, এগুলোর মধ্যে এইচ.টি.ভি.–১২৬ (HTV–126) অর্থাৎ মারেক্সিন সি এ (Marexiue CA) ভালো কাজ করে। এ টিকা একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিতে ০.২ মি.লি. মাত্রায় মাংসপেশি বা ত্বকের নিচে প্রয়োগ করা হয়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার এলাকায় কোনো পোল্ট্রি খামারে মারেক'স রোগ হলে আপনি খামারীকে কী পরামর্শ দেবেন? যুক্তি সহকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ মারেক'স রোগ পোল্ট্রির স্নায়ুতন্ত্রের সংহারী টিউমার বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । হারপেস ভাইরাস ২ পাখিতে এ রোগের কারণ। সাধারণত ৬–১০ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এবং বাচ্চা কোয়েল এতে আক্রান্ত হয়। বাতাস, খাদ্যের বস্তা, যন্ত্রপাতি, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো, আক্রান্ত পাখির মল, শ্লেষ্মা, পাখার গোড়া, ডানা, ঘাড় ইত্যাদিতে অবশতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া রোগের তীব্রতা, পাখির জাত, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন ও টিকা প্রদান এ রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মারেক'স রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

i) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবশতা
ii) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবশতা
iii) মাংসপেশির অবশতা
iv) প্রজননতন্ত্রের অবশতা

খ. কত সপ্তাহ বয়সের মুরগি মারেক'স রোগে আক্রান্ত হয়?

i) ১–২ সপ্তাহ
ii) ২–৪ সপ্তাহ
iii) ৪–৬ সপ্তাহ
iv) ৬–১০ সপ্তাহ

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মারেক'স রোগকে ফাউল প্যারালাইসিসও বলা হয়।
খ. মারেক'স রোগে মৃত পাখির বার্সা ও থাইমাস ফোলা থাকে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মারেক'স রোগের টিকার নাম _____ ।
খ. _____ বিটলের মাধ্যমে মারেক'স রোগ ছড়াতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. মারেক'স রোগের ভাইরাসের নাম কী?
খ. মারেক'স রোগের টিকা কী পরিমাণে একটি মুরগিতে প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ২.৫ ডাক প্লেগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ কী তা বলতে পারবেন।
- ডাক প্লেগের কারণ, সংক্রমণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডাক প্লেগ রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হাঁসের প্লেগ তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। যে কোনো বয়সের হাঁস, রাজহাঁস এতে আক্রান্ত হতে পারে।

হাঁসের প্লেগ বা ডাক প্লেগ (Duck Plague) একটি তীব্র প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে যে কোনো বয়সের গৃহপালিত বা বুনো হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ মহামারি আকারেও দেখা দিতে পারে। উচ্চ মৃত্যুহার, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ও ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে ৫–১০০% মৃত্যুহার হতে পারে। এ রোগকে ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিসও (Duck Viral Enteritis) বলা হয়।

রোগের কারণ

হারপেসভিরিডি (Herpesviridae) পরিবারের অন্তর্গত ডাক হারপেস ভাইরাস ১, অ্যানাটিড হারপেস ভাইরাস ১ বা ডাক প্লেগ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

রোগ সংক্রমণ

রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শ, দুষিত খাদ্য, পানি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে ডাক প্লেগের সংক্রমণ ঘটে।

নিম্নলিখিতভাবে সুস্থ হাঁস বা রাজহাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছড়াতে পারে। যেমন–

- রোগাক্রান্ত পাখির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে।
- দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- রুগ্ন পাখি বেচাকেনার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে।
- কীটপতঙ্গের মাধমে।

রোগের লক্ষণ

আকস্মিক রোগাক্রামণ, অধিক মৃত্যুহার, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা, নাকের শ্লেষ্মা, উসকোখুশকো পালক, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি ডাক প্লেগের লক্ষণ।

আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- আকস্মিক রোগাক্রমণ, অধিক ও অপরিবর্তিত মৃত্যুহার।
- হঠাৎ ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হাঁসের মৃত্যু ঘটে।
- মৃত হাঁসের পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে থাকে।
- আলোকাতঙ্ক দেখা দেয়।
- ক্ষুধামন্দা থাকে।
- প্রচন্ড পিপাসা থাকে।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- পালক উসকোখুশকো হয় ও পাখা ঝুলে থাকে।
- চলাফেরায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়।
- পাতলা পায়খানা হয় যা পাখির লেজের আশেপাশে লেগে থাকে।
- ঘাড়-মাথা বাঁকা করে উপরের দিকে চেয়ে থাকে। এটি ডাক প্লেগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

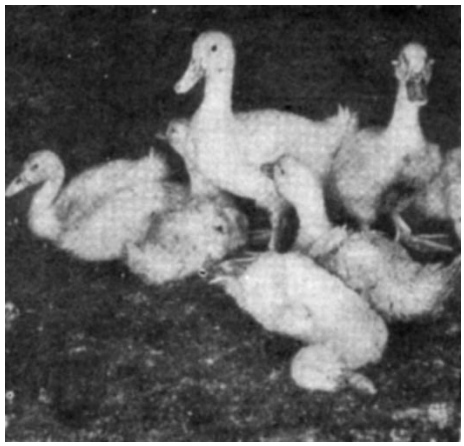

চিত্র ১৪ ঃ ডাক প্লেগ রোগে হঠাৎ সুস্থ হাঁস মারা যায়

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে ডাক প্লেগ রোগ নিরূপন করা হয়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। ময়না তদন্তে নিম্নরূপ প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন–
  - ♦ দেহের বিভিন্ন গহ্বরে রক্ত জমে।
  - ♦ খাদ্যনালি, খাদ্য অন্ত্র, হৃৎপিন্ড, যকৃত, বৃক্ক, ডিম্বাশয়ের ফলিকুল, ক্লোয়েকা প্রভৃতিতে রক্তক্ষরণের চিহ্ন থাকে।
  - ♦ যকৃত ও হৃৎপিন্ডে নেক্রোটিক ফোকাই অর্থাৎ গুচ্ছ গুচ্ছ পচন অংশ দেখা যায়।

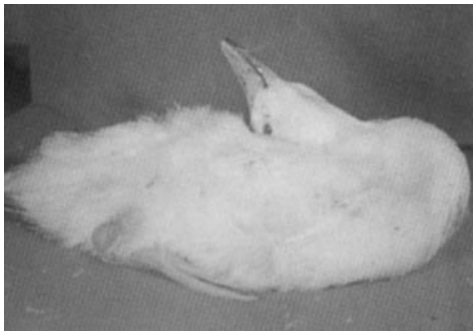

চিত্র ১৫ ঃ ডাক প্লেগ রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই।

রোগপ্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- অসুস্থ হাঁস সুস্থ হাঁস থেকে পৃথক করে রাখতে হবে।
- খামারের ঘরদোর, যন্ত্রপাতি, রোগাক্রান্ত পাখির ঘর, লিটার ইত্যাদি জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ সর্বোত্তম পন্থা।

স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে ডাক প্লেগ রোগপ্রতিরোধ করা যায়।

বাংলাদেশে ডাক প্লেগ রোগের টিকা বা ডাক প্লেগ ভেক্সিন প্রস্তুত করা হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ গবেষণাগারে উৎপাদিত এ টিকা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিস্রুত পানিতে গুলে প্রতিটি সুস্থ হাঁসের রানের মাংসে ১ মি.লি. পরিমাণে ইনজেকশন দিতে হবে। ৩০ দিন বয়সের হাঁসে প্রথমবার এবং ৪৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ দিতে হবে। এরপর ৬ মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

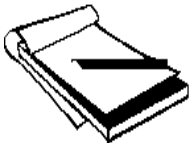

অনুশীলন (Activity) *ঃ ডাক প্লেগ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের (ভাইরাসের) নাম জানেন কি? সে কোন্ পাখিতে কী রোগ সৃষ্টি করে? ডাক প্লেগের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপন করুন।*

সারমর্ম ঃ ডাক প্লেগ হাঁস ও রাজহাঁসের একটি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। এ রোগে যে কোনো বয়সের গৃহপালিত ও বুনো হাঁস আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। ডাক হারপেস ভাইরাস ১ এ রোগের জন্য দায়ী। রোগাক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে দুষিত খাদ্য ও পানি এবং কীটপতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে। হঠাৎ মৃত্যু, পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে যাওয়া, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ও ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন থেকে রোগ নির্ণয় করা হয়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানই সর্বোত্তম পন্থা। ৩০ দিন বয়সে প্রথমবার এবং ৪৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ দিতে হয়। এরপর ছয়মাস পরপর টিকা দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ডাক প্লেগ কোন্ ধরনের রোগ?

i) তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ
ii) ভাইরাসজনিত রোগ
iii) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
iv) i ও ii উভয়ই

খ. ডাক প্লেগের অন্য নাম কী?

i) ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস
ii) ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস
iii) উপরের দু'টোই
iv) কোনোটিই নয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ডাক প্লেগে আক্রান্তের হার বেশি ও মৃত্যুহার কম।
খ. ডাক প্লেগ রোগের চিকিৎসা আছে।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ডাক প্লেগ রোগে মৃত হাঁসের _____ বেরিয়ে আসে।
খ. _____ রোগে আলোকাতঙ্ক দেখা দেয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ডাক প্লেগের ভাইরাসের নাম কী?
খ. ডাক প্লেগ রোগের টিকা কখন কখন দিতে হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৬ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে রাণীক্ষেতের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে রাণীক্ষেত রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।
- রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে ও বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে মুরগির রোগগুলোর মধ্যে রাণীক্ষেত সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে পোল্ট্রির রোগগুলোর মধ্যে মুরগির রাণীক্ষেত রোগ সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এ রোগে দেশের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। এটি এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে মুরগির শ্বাসনালি, অন্ত্রনালি ও স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাঠ ২.১ এ রাণীক্ষেত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি এ পাঠ ছাড়াও পাঠ ২.১ এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে সংযোজিত রঙিন প্লেটে আক্রান্ত পাখির রঙিন ছবি (রঙিন চিত্র ১–৪) দেয়া হয়েছে। পাঠ ২.১ ভালোভাবে পড়ুন এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

উপকরণ

১. রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত পাখির ছবি অথবা সম্ভব হলে একটি আক্রান্ত মুরগি।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে রোগাক্রান্ত পাখি বা পাখির ছবি আপনার সামনে নিয়ে আসুন।
- আক্রান্ত পাখির বয়স জেনে নিন বা অনুমান করুন।
- ছবি না হয়ে সত্যিকারের পাখি হলে এর পরিচর্যাকারী বা মালিকের কাছ থেকে রোগ হওয়ার ইতিহাস জেনে নিন।
- এবার আক্রান্ত পাখি বা ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন ও এর শারীরিক অবস্থা বা দৈহিক পরিবর্তনগুলো নোট করুন।

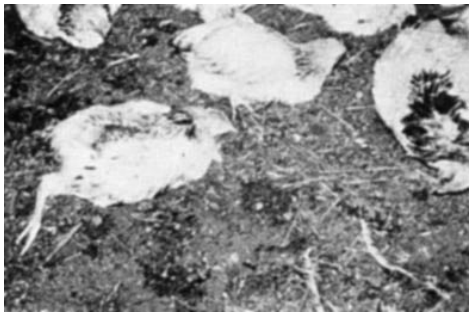

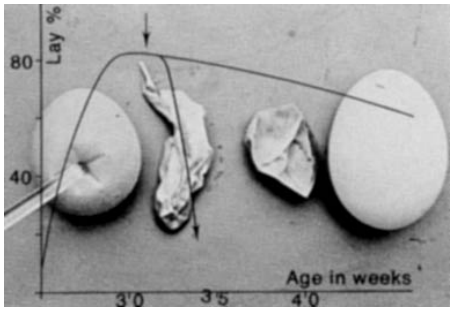

ক– আক্রান্ত মুরগি খ– আক্রান্ত মুরগির ডিম

চিত্র ১৬ (ক, খ) ঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি ও মুরগির ডিম

- আপনার দেখা পরিবর্তনগুলোর সাথে পাঠ ২.১ এ পড়া রাণীক্ষেতের রোগলক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন।
- এবার এ লক্ষণগুলো থেকে রাণীক্ষেত রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- প্রয়োজনে আপনার কোনো সহপাঠির সঙ্গে আলোচনা করে রোগলক্ষণ শণাক্ত করুন।
- এবার পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন। প্রয়োজনে ছবি আঁকুন।
- ব্যবহারিক খাতা টিউটরকে দেখান ও সই নিন।

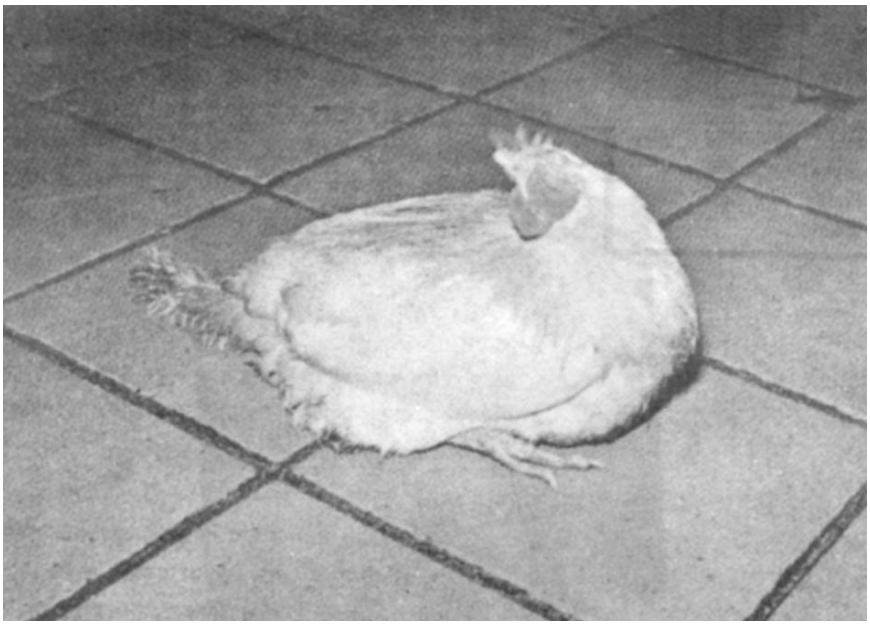

চিত্র ১৭ ঃ রাণীক্ষেত রোগে মুরগির ঘাড় বেঁকে যায়

সাবধানতা

- আক্রান্ত পাখি বা ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৭ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে বসন্তের লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে বসন্ত রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।
- বসন্ত রোগের লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে ও বলতে পারবেন।

বসন্ত ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পাখির বসন্ত বা ফাউল পক্স একটি ভাইরাসজনিত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স এবং প্রজাতির পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে পাখির দেহের পালকহীন স্থানে এবং মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি ও অন্ত্রে বসন্তের গুটি দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত পাখিতে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যুহার হতে পারে। বসন্ত রোগ সম্পর্কে পাঠ ২.২ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি এ পাঠ ছাড়াও পাঠ ২.২ এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে সংযোজিত রঙিন প্লেটে আক্রান্ত পাখির রঙিন ছবি (রঙিন চিত্র ৫–৬) দেয়া হয়েছে। পাঠ ২.২ ভালোভাবে পড়ুন এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

উপকরণ

১. বসন্ত রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি বা সম্ভব হলে একটি রোগাক্রান্ত মুরগি।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে রোগাক্রান্ত মুরগির ছবি বা মুরগি আপনার সামনে নিয়ে আসুন।
- আক্রান্ত পাখির বয়স জেনে নিন বা অনুমান করুন।
- ছবি না হয়ে বসন্তে আক্রান্ত পাখি হলে এর মালিক বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে রোগ হওয়ার ইতিহাস জেনে নিন।
- এবার আক্রান্ত পাখি বা ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন ও পাখির শারীরিক অবস্থা বা দৈহিক পরিবর্তনগুলো নোট করুন।

চিত্র ১৮ ঃ ত্বকীয় প্রকৃতিতে মুরগির মুখে বসন্তের গুটি

- আপনার দেখা পরিবর্তনগুলোর সাথে পাঠ ২.১ এ বর্ণিত রোগলক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন।
- প্রয়োজনে আপনার কোনো সহপাঠির সঙ্গে আলোচনা করে রোগলক্ষণ শণাক্ত করুন।
- এবার এ লক্ষণগুলো থেকে বসন্ত রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।
- পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ও রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলো ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখুন। প্রয়োজনে ছবি আঁকুন।
- ব্যবহারিক খাতাটি টিউটরকে দেখান ও তাতে সই নিন।

চিত্র ১৯ ঃ ডিপথেরিটিক প্রকৃতিতে মুরগির মুখগহবরে বসন্তের ক্ষত

সাবধানতা

- আক্রান্ত পাখি বা ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাইরাস কী? পোল্ট্রির পাঁচটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম লিখুন।
২। রাণীক্ষেত রোগের কারণ ও লক্ষণ লিখুন।
৩। কীভাবে রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধ করবেন?
৪। বসন্ত কয় প্রকৃতির? নামসহ বর্ণনা করুন।
৫। কীভাবে বসন্ত রোগ নির্ণয় করবেন? এর চিকিৎসা আছে কী?
৬। পোল্ট্রি এইডস কী? এ রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৭। গামবোরো রোগের কারণ ও সংক্রমণ পদ্ধতি লিখুন।
৮। কোন্ রোগকে পোল্ট্রির ক্যানসার বলে? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৯। বাংলাদেশে হাঁসের প্রধান ভাইরাসজনিত রোগ কোন্‌টি? কীভাবে এ রোগ নির্ণয় করবেন।
১০। মারেক'স ও ডাক প্লেগ রোগের মধ্যকার মিল ও অমিল খুঁজে বের করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। ক. ii ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. নিউমো-এনসেফালাইটিস ৩। খ. সাদাটে
৪। ক. ভেলোজেনিক, মেসোজেনিক ও লেন্টোজেনিক ৪। খ. বি.সি.আর.ডি.ভি. ও আর.ডি.ভি.

পাঠ ২.২

১। ক. iii ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. বাইফর্কড ৩। খ. এক মাসের
৪। ক. ত্বকীয়, হেড বা শুষ্ক প্রকৃতির এবং ডিপথেরিটিক বা আর্দ্র প্রকৃতির ৪। খ. পিজিয়ন পক্স টিকা ও ফাউল পক্স টিকা

পাঠ ২.৩

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. দেলওয়ার ৩। খ. ফুলে
৪। ক. বার্সা অব ফ্যাব্রিসিয়াস ৪। খ. চোখে ড্রপ হিসেবে বা মুখ দিয়ে পান করানোর মাধ্যমে

পাঠ ২.৪

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. HTV–126 ৩। খ. ডার্কলিং
৪। ক. হারপেস ভাইরাস ২ বা মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস ৪। খ. ০.২ মি.লি. মাত্রায়

পাঠ ২.৫

১। ক. iv ১। খ. ii ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. পুরুষাঙ্গ ৩। খ. ডাক প্লেগ
৪। ক. ডাক হারপেস ভাইরাস ১, অ্যানাটিড হারপেস ভাইরাস ১ বা ডাক প্লেগ ভাইরাস
৪। খ. ৩০ দিন, ৪৫ দিন ও ৬ মাস পরপর

ইউনিট ৩
পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ

ইউনিট ৩ পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ

পোল্ট্রির বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ অন্যতম। ব্যাকটেরিয়া অতিক্ষুদ্র এককোষি অণুবীক্ষণিক জীবাণু। গঠন অনুযায়ী এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন– গোলাকার বা কক্কাস, দন্ডাকৃতির বা ব্যাসিলাস, বাঁকা দন্ডাকৃতির বা কমা আকৃতির অর্থাৎ ভিব্রিওস, প্যাচানো বা স্পাইরোকিট ইত্যাদি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরে সুতোর মতো ফ্লাজেলা বা পিলাই থাকে। ব্যাকটেরিয়ার আয়তন ০.৪–১.৫ মাইক্রোমিটার হয়। মাইকোপ্লাজমার আয়তন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাঝামাঝি। এরা ০.১৫–১.০ মাইক্রোমিটার হয়। এ জীবাণুর কোনো কোষপ্রাচীর নেই। তবে কোষ তিনটি স্তরের প্লাজমা স্লারা আবৃত। ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা মানুষসহ বিভিন্ন পশুপাখির দেহে আশ্রয় নিয়ে জীবনধারণ করে। এরা আশ্রয়দাতা বা পোষকের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। পোল্ট্রি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং মাইকোপ্লাজমা স্লারা আক্রান্ত হতে পারে। এতে উৎপাদন হ্রাস ছাড়াও এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে খামারী তথা দেশের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। এদেশে পোল্ট্রির বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে কলেরা, পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, সংক্রামক সর্দি বা করাইজা, কলিব্যাসিলোসিস, আলসারেটিভ এন্টারাইটিস, নেক্রোটিক এন্টারাইটিস, বটুলিজম, স্ট্রেপটোকক্কোসিস, স্ট্যাফাইলোকক্কোসিস ইত্যাদি প্রধান। মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগের মধ্যে ক্রনিক রেসপাইরেটরি ডিজিজ ও ইনফেকশাস সাইনুভাইটিস অন্যতম। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারলে অনেক রোগই সেরে যায়। মাইকোপ্লাজমার দেহে কোষপ্রাচীর নেই বলে পেনিসিলিন কাজ করতে পারে না। খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারলে, পোল্ট্রিকে পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করলে এবং নির্ধারিত সময়ে টিকা প্রদান করলে এদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে হাঁসমুরগির কলেরা, পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, সংক্রামক সর্দি বা করাইজা ও মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ হাঁসমুরগির কলেরা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসমুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা কী তা বলতে পারবেন।
- ফাউল কলেরার কারণ ও সংক্রমণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাঁস ও মুরগির ক্ষেত্রে কলেরার লক্ষণগুলো লিখতে পারবেন।
- হাঁসমুরগির কলেরা রোগ নির্ণয় করতে পারবেন ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- হাঁসমুরগির কলেরা প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ফাউল কলেরা হাঁসমুরগি ও অন্যান্য পাখির মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। উচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যু হার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হাঁসমুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা (Fowl Cholera) হাঁসমুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য পাখির একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে পাখির সেপ্টিসেমিয়া হয়। উচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যু হার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব বয়সের পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁসমুরগির ঘর স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকলে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। সঠিকভাবে রোগ শণাক্ত করে চিকিৎসা করতে না পারলে মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া এ রোগ একবার দেখা দিলে দমন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যদিও সাধারণভাবে এ রোগকে ফাউল কলেরা বলে, কিন্তু অ্যাভিয়ান পাসচুরেলোসিস, অ্যাভিয়ান হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। তবে, হাঁসের ক্ষেত্রে এ রোগকে হাঁসের কলেরা বা ডাক কলেরা বলা হয়।

রোগের কারণ

Pasteurella multocida (পাসচুরেলা মালটুসিডা) নামক এক প্রকার গ্রাম নেগেটিভ ক্ষুদ্র দন্ডাকৃতির বাইপোলার ব্যাকটেরিয়া এ রোগের একমাত্র কারণ।

রোগ সংক্রমণ

বাহক হাঁসমুরগির সংস্পর্শ, বন্য পাখি, আক্রান্ত পাখির সর্দি, কলুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো, খামারের সরঞ্জামাদি, কৃত্রিম প্রজনন প্রভৃতির মাধ্যমে সুস্থ পাখি আক্রান্ত হয়।

এ রোগ নিম্নলিখিতভাবে সংক্রমিত হয়। যথা–

- সংবেদনশীল হাঁসমুরগির ঘরে কোনো বাহক হাঁসমুরগি থাকলে বা প্রবেশ করলে।
- বন্য পাখি বা অন্যান্য বাহক প্রাণীর সংস্পর্শে সংবেদনশীল পাখি আসলে।
- একই ঘরের বা খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়। যথা–
  - ♦ আক্রান্ত হাঁসমুরগির নাকের সর্দির (Nasal Exudate) মাধ্যমে।
  - ♦ এ রোগে মৃত হাঁসমুরগিকে ঠোকর দিলে।
  - ♦ কলুষিত পানির মাধ্যমে।
  - ♦ মানুষের জামা, জুতো, ঘরে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।
  - ♦ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আক্রান্ত মোরগ থেকে সুস্থ মুরগিতে।

রোগের লক্ষণ

মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রিতে সাধারণত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এবং হাঁসে অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ দেখা যায়।

মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রিতে সাধারণত দুপ্রকৃতিতে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন– তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি। কিন্তু, হাঁসে এ রোগের লক্ষণ তিন প্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা– অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি।

কলেরা রোগে আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

তীব্র প্রকৃতিতে (Acute Form)–

- হঠাৎ ধপ করে পড়ে মারা যায়। রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই অর্থাৎ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়।
- সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে। অনেক সময় পায়খানা ফেনাযুক্ত হয়।
- নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়ে।

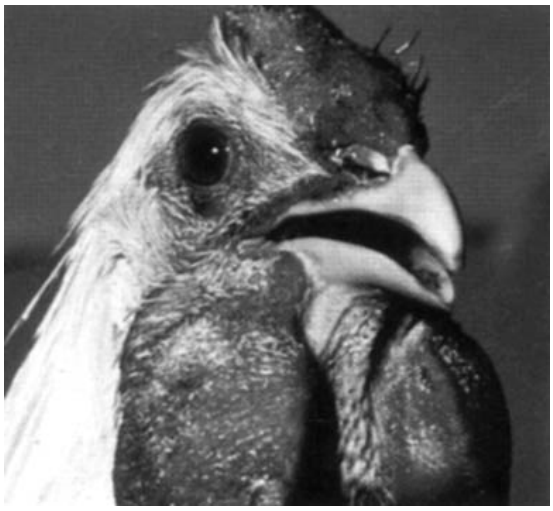

চিত্র ২০ ঃ কলেরায় আক্রান্ত মোরগের ফোলা মাথা ও গলার ফুল

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিতে (Chronic Form)–

- গলার ফুল ফুলে যায় (বিশেষ করে মোরগের ক্ষেত্রে)।
- মাথার ঝুঁটি একেবারে কালো হয়ে যায়।
- মাথা বাঁকা হয়ে (Twisting) বসে থাকে।
- সন্ধিপ্রদাহ বা আরথ্রাইটিস (Arthritis) হয় এবং পা খোঁড়া হয়ে যায়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যায় এবং দুমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকে।
- অবশেষে আস্তে আস্তে মারা যায়।

কলেরায় আক্রান্ত হাঁসে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

অতিতীব্র প্রকৃতিতে (Peracute Form)–

- রোগলক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই হাঁস মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতিতে (Acute Form)–

- ক্ষুধামন্দা কিন্তু অধিক পিপাসা দেখা দেয়।
- জ্বর হয় ও পালক উসকোখুশকো হয়ে যায়।
- আক্রান্ত হাঁসের মুখ দিয়ে পিচ্ছিল তরল পদার্থ বের হয়।
- প্রথমে সাদা ও শেষে সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা হয়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিতে (Chronic Form)–

- পায়ের অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ হয় এবং সে স্থান ফুলে যায় ও পাখি খোঁড়ায়।
- হাঁসের স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

রোগ নির্ণয়

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ময়না তদন্ত ও গবেষণাগারে জীবাণু শণাক্তকরণের মাধ্যমে কলেরা রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে হাঁসমুরগির কলেরা রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যেমন–
  - অন্ত্রে রক্তক্ষরণ।
  - যকৃতে ছোট ছোট সাদা দাগ।
  - হৃৎপিন্ডের বাইরের সাদা অংশে রক্তের ফোঁটা।
  - মৃত হাঁসের সমস্ত অঙ্গে রক্তক্ষরণ ও রক্তাধিক্য।

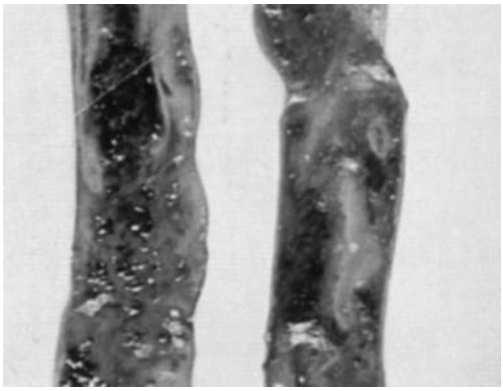

চিত্র ২১ ঃ কলেরায় আক্রান্ত পাখির অন্ত্রে রক্তক্ষরণ

- গবেষণাগারে জীবাণু কালচার করে।

চিকিৎসা

আক্রান্ত পাখিতে নির্ধারিত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড প্রয়োগ করে কলেরার চিকিৎসা করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ উল্লেখিত মাত্রায় প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। যথা–

- ফ্লুমেকুইন ১০% পাউডার ১ গ্রাম/২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।
- অথবা ফ্লুমেকুইন ২০% সলুশন ১ মি.লি./৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।
- এছাড়াও ট্রাইমেথোপ্রিম, সালফামেথোক্সিন, সালফাকুইনোক্সালিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও দমন

সঠিক খামার ব্যবস্থাপনা, মাঝেমধ্যে চিকিৎসার অর্ধেক মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে কলেরা রোগ প্রতিরোধ ও দমন করা যায়।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে হাঁসমুরগির কলেরা রোগ প্রতিরোধ ও দমন করা যাবে। যথা–

- খামার ব্যবস্থাপনা– সব সময় খামারের আশেপাশে জীবাণুনাশকের ব্যবহার বাড়ানো, লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা, এক ঘরের সরঞ্জমাদি অন্য ঘরে নেয়ার সময় জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ব্যবহার করা ইত্যাদি মেনে চলতে হবে।
- রোগ সারানোর জন্য ওষুধ ব্যবহারের পরও মাঝেমধ্যে চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের অর্ধেক মাত্রায় হাঁসমুরগিকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।
- নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের পশুসম্পদ গবেষণাগারে প্রস্তুত টিকার নাম ফাউল কালেরা টিকা। মুরগির ক্ষেত্রে ১ মি.লি. করে পাখার চামড়ার নিচে এ টিকা ইনজেকশন আকারে দিতে হয়। ৭৫ দিন বয়সে ১ম ডোজ ও ৯০ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ দিতে হয়। হাঁসের ক্ষেত্রে ১ মি.লি. করে টিকা বুকের চামড়ার নিচে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। তাছাড়া বিদেশ থেকেও এ রোগের টিকা আমদানি করা হয়। যেমন– নবিলিস এফসি ইনাক (ইন্টারভেট) যা ০.৫ মি.লি. মাত্রায় ৮ ও ১৬ সপ্তাহ বয়সে পাখির ঘাড়ের পিছনের চামড়ার নিচে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়।

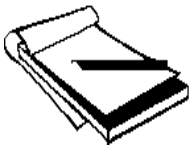

অনুশীলন (Activity) ঃ হাঁসমুরগির কলেরার মধ্যে কী কী মিল ও অমিল রয়েছে? ছকের মাধ্যমে লিখুন।

সারমর্ম ঃ হাঁসমুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা গৃহপালিত ও বন্য পাখির একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। সেপ্টিসেমিক ধরনের এ রোগে মৃত্যু হার অধিক হয়। তাছাড়া ডায়রিয়া এ রোগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং ত্রুটিপূর্ণ খামার ব্যবস্থাপনায় এ রোগ বেশি হয়। *Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। বাহক হাঁসমুরগির সংস্পর্শ, বন্য পাখি, আক্রান্ত পাখির সর্দি, কলুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো, খামারের সরঞ্জামাদি, কৃত্রিম প্রজনন প্রভৃতির মাধ্যমে সুস্থ পাখি আক্রান্ত হয়। মুরগি ও অন্যান্য পাখিতে সাধারণত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির এবং হাঁসে অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ময়না তদন্ত ও গবেষণাগারে জীবাণু শণাক্তকরণের মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। নির্ধারিত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড প্রয়োগ করে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। সঠিক খামার ব্যবস্থাপনা, মাঝেমধ্যে চিকিৎসার অর্ধেক মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ ও টিকা প্রদানের মাধ্যমে কলেরা রোগ প্রতিরোধ ও দমন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মাইকোপ্লাজমার আয়তন কত?

i) ০.৪–১.৫ মাইক্রোমিটার
ii) ০.৩–১.২ মাইক্রোমিটার
iii) ০.১–০.৫ মাইক্রোমিটার
iv) ০.১৫–১.০ মাইক্রোমিটার

খ. মাইকোপ্লাজমার বিরুদ্ধে কেন পেনিসিলিন কাজ করে না?

i) পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট বলে
ii) এদের দেহে কোষপ্রাচীর নেই বলে
iii) উপরের দুটোই সঠিক
iv) কোনোটিই সঠিক নয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. *Pasteurella multocida* গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া।
খ. উচ্চ মৃত্যু হার কলেরার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ হাঁসমুরগিরকে ঠোকর দিলে কলেরা রোগ ছড়াতে পারে।
খ. কলেরায় মৃত পাখির যকৃতে ছোট ছোট _____ দাগ দেখা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ময়না তদন্তে মৃত হাঁসের সমস্ত অঙ্গে কী দেখা যায়?
খ. মুরগিকে কখন কলেরার টিকা প্রদান করতে হয়?

পাঠ ৩.২ পুলোরাম রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পুলোরাম রোগ কী তা বলতে পারবেন?
- পুলেরাম রোগের কারণ ও সংক্রমণ পদ্ধতি লিখতে পারবেন।
- পুলোরাম রোগে আক্রান্ত মুরগির লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ নির্ণয় করে কীভাবে পুলোরাম রোগ চিকিৎসা ও দমন করবেন তা আলোচনা করতে পারবেন।

পুলোরাম বাচ্চা মুরগির মারাত্মক ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। তিন সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চা এতে আক্রান্ত হয়।

বাচ্চা মুরগির বিভিন্ন রোগের মধ্যে পুলোরাম রোগ (Pullorum Disease) একটি মারাত্মক সেপ্টিসেমিক রোগ। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে সাধারণত তিন সপ্তাহের কম বয়সের মুরগির বাচ্চা আক্রান্ত হয়। তবে, বয়স্ক মুরগিও এতে আক্রান্ত হতে পারে। বয়স্ক মুরগিতে তেমন কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারলেও জীবাণুগুলো মুরগির মধ্যে থেকে যায় ও পরবর্তীতে ডিমের মাধ্যমে বাচ্চাতে সংক্রমিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই এ রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। ভারি জাতের মুরগি হালকা জাতের মুরগির চেয়ে এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। মুরগি ছাড়াও এ রোগে টার্কি, হাঁস, কোয়েল, কবুতর ও অন্যান্য বন্য পাখি আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগটি ব্যাসিলারি সাদা পায়খানা বা ব্যাসিলারি হোয়াইট ডায়রিয়া নামেও পরিচিত।

রোগের কারণ

Salmonella pullorum (সালমোনেলা পুলোরাম) নামক এক ধরনের নড়ন অক্ষম (Non-motile), দন্ডাকৃতির, অ্যারোবিক ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কারণে পুলোরাম রোগ হয়।

সংক্রমণ পদ্ধতি

বাহক পোল্ট্রি, ডিম, অস্বাস্থ্যকর হ্যাচারি ও ইনকিউবেটর, দুষিত মল ও খাদ্য, মানুষের জামা-জুতো ও খামারের অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে পুলোরাম রোগ ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে সুস্থ মুরগিতে এ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেমন–

- বাহক বয়স্ক পোল্ট্রির মাধ্যমে।
- অস্বাস্থ্যকর হ্যাচারি ও ডিম ফোটানোর যন্ত্রের মাধ্যমে।
- ডিমের খোসায় সে অসংখ্য ছিদ্র রয়েছে সে ছিদ্রপথে জীবাণু ডিমের ভিতরে প্রবেশ করে বাড়ন্ত ভ্রূণকে আক্রান্তের মাধ্যমে বাচ্চার মধ্যে সংক্রমিত হয়।
- দুষিত মল বা টিকা ও খাদ্যের মাধ্যমে।
- মুক্তভাবে বিচরণকারী পাখির মাধ্যমে।
- মানুষের ব্যবহৃত জামা-জুতো, ডিমের ট্রে, লিটার ইত্যাদির মাধ্যমে।

রোগের লক্ষণ

ফোটানোর ডিমে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে ডিমের ভিতর বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে।

বাচ্চা মুরগিতে–

- ডিমের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমিত হলে অনেক সময় ডিমের ভিতরেই বাচ্চার মৃত্যু ঘটে, বিশেষ করে ডিম ফোটার ২–৩ দিন পূর্বে বাচ্চা মারা যায়। অনেক সময় ডিম থেকে ফোটার অল্পক্ষণের মধ্যেই বাচ্চার মৃত্যু ঘটে।
- ঘন ঘন সাদা পাতলা পায়খানা হয় ও তা মলদ্বারের চারপাশে লেগে থাকে। এজন্য এ রোগকে ব্যাসিলারি সাদা পায়খানাও (Bacillary White Diarrhoea) বলে।
- বাচ্চা চিঁ চিঁ শব্দ করে ব্রুডারের তাপের উৎসের কাছে জড়ো হয়ে থাকে।
- বাচ্চা কিছু খায় না, তবে ঘন ঘন পানি পান করতে দেখা যায়।

বয়স্ক মুরগিতে–

বয়স্ক মুরগি আক্রান্ত হলে তেমন কোনো রোগ লক্ষণ দেখা যায় না। তবে, কখনো কখনো আক্রান্ত মুরগির–

বয়স্ক মুরগি আক্রান্ত হলে তেমন কোনো রোগলক্ষণ দেখা যায় না।

- ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।
- মাথার ঝুঁটি ফ্যাকাশে ও সংকুচিত হতে পারে।
- মাঝেমধ্যে ডায়রিয়া দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ শণাক্ত করা যায়। যেমন–

রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, ময়না তদন্তে প্রাপ্ত ফল ও গবেষণাগারে মল কালচারের মাধ্যমে জীবাণু শণাক্ত করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

- রোগের ইতিহাস অর্থাৎ আক্রান্ত পাখির বয়স ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এ রোগে মৃত পাখিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা–
  - যকৃত বড় হয়ে যায় ও তামাটে বর্ণ ধারণ করে। এতে ডোরাকাটা দাগও থাকতে পারে।
  - প্লীহায় নানা বর্ণের দাগ, রক্তক্ষরণের চিহ্ন, নেক্রোটিক ফোকাই ইত্যাদি থাকতে পারে।
  - বাহক ডিমপাড়া মুরগির ডিমাশয় বিকৃত, বিবর্ণ ও সিস্টিক বা পানিপূর্ণ হয়।

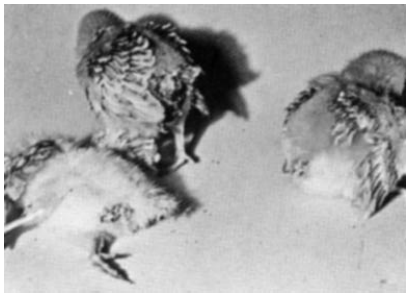

চিত্র ২২ (ক) ঃ পুলোরাম রোগে আক্রান্ত বাচ্চা মুরগি

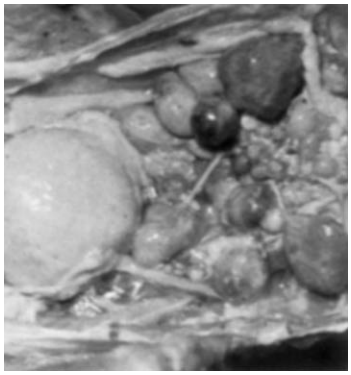

চিত্র ২২ (খ) ঃ পুলোরাম রোগে আক্রান্ত ডিমপাড়া মুরগির বিকৃত ডিম্বাশয়

- গবেষণাগারে মল কালচার করে জীবাণু শণাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

বিভিন্ন ধরনের সালফোনেমাইড, নাইট্রোফিউরানস এবং অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহার করে পুলোরামের চিকিৎসা করা যায়।

নিম্নের যে কোনো একটি ওষুধ দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। যেমন–

- বিভিন্ন ধরনের সালফোনেমাইড, যেমন– সালফাডায়াজিন, সালফামেরাজিন, সালফাকুইনোক্সালিন ও সালফামেথাজিন ভেটেরিনারি সার্জনের নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

- নাইট্রোফিউরানস অর্থাৎ ফুরাজোলিডন ০.০৪% হিসেবে খাদ্যে মিশিয়ে ১০–১৪ দিন খাওয়ালে এ রোগ সেরে যায়।
- ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, পলিমিক্সিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ভেটেরিনারি সার্জনের নির্দেশিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

রোগপ্রতিরোধ ও দমন

পুলোরাম রোগ দমনে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা করতে পারলেই ভালো।

এ রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার চেয়ে রোগপ্রতিরোধ ও দমনের দিকে সাধারণত বেশি নজর দেয়া হয়। এ রোগের তেমন কোনো টিকা নেই। এ রোগ প্রতিরোধ ও দমনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–

ক. মুরগির ঝাঁকের স্বাস্থ্যবিধি–

- মুরগির বাচ্চাকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে পালন করতে হবে। একসঙ্গে পালন করা যাবে না।
- বন্য পাখি যাতে মুরগি পালন এলাকায় না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আক্রান্ত বাচ্চার মল যাতে পাত্রে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘরের লিটার জীবাণুনাশক, যেমন– চুন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

পুলোরাম রোগ দমনের জন্য খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, যেমন– মুরগির ঝাঁকের স্বাস্থ্যবিধি, ফোটানো ডিম ও হ্যাচারি সেনিটেশন, হ্যাচারি ও মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ, ফিউমিগেশন প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।

খ. ফোটানোর ডিমের সেনিটেশন ব্যবস্থা–

- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ট্রেতে (Tray) ফোটানোর ডিম সংগ্রহ করতে হবে।
- ময়লাযুক্ত ডিম ভালো ডিমের সঙ্গে একই ট্রেতে সংগ্রহ করা যাবে না এবং ফোটানোর জন্যও ব্যবহার করা যাবে না।
- ডিম সংগ্রহের পর যথাশীঘ্র ফিউমিগেশন (Fumigation) করতে হবে।
- ফিউমিগেট করা ডিম জীবাণুমুক্ত ট্রেতে ঠান্ডা করতে হবে।

গ. হ্যাচারি সেনিটেশন ব্যবস্থা–

- ডিম গ্রহণ, ফোটানো ও হ্যাচারির জন্য আলাদা আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় আলোবাতাস ঢুকতে পারে।
- প্রত্যেকবার বাচ্চা ফোটানোর পর সকল সরঞ্জামাদি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ইনকিউবেটরে ডিম বসানোর পর ফিউমিগেশন করতে হবে।
- চিক বক্স, বাচ্চা বহনকারী বাহন ইত্যাদি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ঘ. হ্যাচারি ও মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ–

- ঘরের লিটার পরিষ্কার হতে হবে এবং মল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরের দেয়াল, মেঝে ও সরঞ্জামাদি পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরের মেঝে কস্টিক সোডা দিয়ে পরিষ্কার করলে ভালো হয়।
- ঘরের মেঝে, দেয়াল, সরঞ্জামাদি একটি ভালো জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে পরিষ্কার করলে ভালো হয়।
- ঘর এবং হ্যাচারি ফিউমিগেশন করতে হবে।

ঙ. ফিউমিগেশনকরণ–

- ডিম বসানোর ২৪–৮৪ ঘন্টার মধ্যে ফিউমিগেশন করা যাবে না।
- ফিউমিগেশন শুরু করার পূর্বে ঘরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে যাতে ঘরে কোনো বাতাস না ঢুকে।

- ঘরের প্রতি ২.৮ ঘন মিটার জায়গার জন্য ৬ গ্রাম পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট ও ১২০ মি.লি. ফরমালিন ৪০% দিয়ে ফিউমিগেট করতে হবে।
- প্রতি ব্যাচ বাচ্চা ফোটার পর ইনকিউবেটরের হ্যাচার চেম্বার ফিউমিগেট করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ এদেশে পুলোরাম রোগের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।*

সারমর্ম ঃ পুলোরাম বাচ্চা মুরগির একটি মারাত্মক ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। সাধারণত তিন সপ্তাহের কম বয়সের মুরগির বাচ্চা এতে আক্রান্ত হতে পারে। মুরগি ছাড়াও এ রোগে টার্কি, হাঁস, কোয়েল, কবুতর ও অন্যান্য বুনো পাখি আক্রান্ত হতে পারে। *Salmonella pullorum* নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। বাহক পোল্ট্রি, ডিমের মাধ্যমে, অস্বাস্থ্যকর হ্যাচারি ও ইনকিউবেটর, দুষিত মল ও খাদ্য, মানুষের জামা-জুতো ও খামারের অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। বাচ্চা মুরগিতে ডিমের ভিতর বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে। আক্রান্ত বাচ্চার সাদা পায়খানা হওয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাচ্চা কিছু খেতে চায় না, কিন্তু ঘন ঘন পানি পান করে। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে ও গবেষণাগারে মল কালচার করে জীবাণু শণাক্ত করে রোগ নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন ধরনের সালফোনেমাইড, নাইট্রোফিউরানস ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। তবে, চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা করতে পারলেই ভালো। এ রোগ দমনের জন্য খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, যেমন– মুরগির ঝাঁকের স্বাস্থ্যবিধি, ফোটানো ডিমের সেনিটেশন, হ্যাচারি সেনিটেশন, হ্যাচারি ও মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ, ফিউমিগেশন প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. পুলোরাম রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কী?

i) *Salmonella newport*
ii) *Salmonella typhi*
iii) *Solmonella gallinarum*
iv) *Salmonella pullorum*

খ. পুলোরাম রোগের প্রধান শিকার কারা?

i) ৩ মাসের কম বয়সের মুরগির বাচ্চা
ii) ৩ মাসের অধিক বয়সের মুরগির বাচ্চা
iii) ৩ মাস বয়সের মুরগির বাচ্চা
iv) বয়স্ক মুরগি

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পুলোরাম ডিমবাহিত রোগ।
খ. পুলোরাম রোগে বয়স্ক পাখি প্রধানত বাহক হিসেবে কাজ করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. পুলোরাম রোগ মুরগির বাচ্চার মারাত্মক _____ রোগ।
খ. পুলোরাম রোগে _____ ভিতরে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পুলোরাম রোগকে কী বলে?
খ. কীভাবে এ রোগ দমন করবেন?

পাঠ ৩.৩ মুরগির টাইফয়েড রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুরগির টাইফয়েড রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- মুরগির টাইফয়েড রোগের কারণ ও সংক্রমণ লিখতে পারবেন।
- টাইফয়েডের লক্ষণ বর্ণনা ও রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।
- মুরগির টাইফয়েড রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও দমন আলোচনা করতে পারবেন।

ফাউল টাইফয়েড মুরগি ও অন্যান্য পাখির সেপ্টিসেমিক রোগ। এতে ৩ মাসের বেশি বয়সের মুরগি আক্রান্ত হয়।

মুরগির টাইফয়েড (Fowl Typhoid) মুরগি ও অন্যান্য গৃহপালিত পাখির একটি সেপ্টিসেমিক রোগ। এ তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগে সাধারণত বাড়ন্ত বয়স্ক মুরগি (৩ মাস থেকে ডিমপাড়া পর্যন্ত) বেশি আক্রান্ত হয়। তবে, সব বয়সের পাখিই আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যু হার ২০–৮০% পর্যন্ত হতে পারে। এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দিতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রোগ হয়।

কারণ

Salmonella gallinarum (সালমোনেলা গ্যালিনেরাম) নামক এক ধরনের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য দায়ী।

রোগ সংক্রমণ

বাহক ও আক্রান্ত পাখির মল ও অন্যান্য নিঃসরণের মাধ্যমে দুষিত খাদ্য, লিটার, পানি, বাতাস ইত্যাদি; ডিম; বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ এবং মানুষের মাধ্যমে টাইফয়েডের সংক্রমণ ঘটে।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। যথা–

- বাহক ও আক্রান্ত পাখির মল ও অন্যান্য নিঃসরণের মাধ্যমে লিটার, খাদ্য, পানি ও বাতাস দুষিত হয়ে এ রোগ ছড়ায়।
- বাহক ও আক্রান্ত পাখির ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় এ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে।
- বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ এ রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।
- খামারে পোল্ট্রির পরিচর্যায় নিয়োজিত লোক ও পোল্ট্রি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য লোকের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়ায়।

রোগলক্ষণ

টাইফয়েড রোগে বাচ্চা ও বড় মুরগিতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এ রোগ বাচ্চা এবং বড় মুরগিতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো–

বাচ্চা পাখিতে লক্ষণ ঃ বাচ্চা পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ডিমের মাধ্যমে সংক্রমিত হলে পুলোরাম রোগের ন্যায় লক্ষণ দেখা যায়। ডিমের ভিতরে বাচ্চা মারা যেতে পারে অথবা মৃতপ্রায় অবস্থায় বাচ্চা ফোটে।
- আক্রান্ত বাচ্চায় নিদ্রালু ভাব থাকে।
- ক্ষুধামন্দা ও দুর্বলতা দেখা যায়।
- রোগ থেকে সেরে ওঠা বাচ্চার স্বাস্থ্যের উন্নতি সহজে হয় না।

টাইফয়েড রোগে বাড়ন্ত ও বয়স্ক পাখিতে অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির রোগলক্ষণ দেখা যায়।

বাড়ন্ত ও বয়স্ক পাখিতে লক্ষণ ঃ বাড়ন্ত ও বয়স্ক পাখিতে অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির রোগলক্ষণ দেখা যায়।

অতিতীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে–

- হঠাৎ করে আক্রান্ত পাখি মারা যায়।
- কিছু পাখি অল্প ক'ঘন্টা বেঁচে থাকে।
- এসব পাখিতে জ্বর ও উত্তেজনা দেখা যায়।
- শেষে পাখি নিস্তেজ হয়ে মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে–

তীব্র প্রকৃতির টাইফয়েড রোগে সবুজ বা হলুদ রঙের ডায়রিয়া দেখা যায়।

- প্রথমে জ্বর দেখা যায়।
- এরপর খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা যায় ও পাখি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
- মাথার ফুল বিবর্ণ ও সংকুচিত হয়।
- সবুজ বা হলুদ রঙের ডায়রিয়া দেখা দেয়। এ ডায়রিয়া পাখির মলদ্বারের আশেপাশের পালকে লেগে থাকে।
- এ অবস্থায় অনেক পাখি মারা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির ক্ষেত্রে–

- তীব্র প্রকৃতির রোগ থেকে সেরে ওঠা পাখি সাধারণত এ প্রকৃতির রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। এরা এ অবস্থায় সাধারণত বাহকে পরিণত হয়।
- এসব পাখির মাথা ও গলার ফুল ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- এদের ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।

চিত্র ২৩ ঃ ফাউল টাইফয়েডে আক্রান্ত মুরগির বাচ্চা

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে ফাউল টাইফয়েড নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস, যেমন– আক্রান্ত পাখির বয়স থেকে।
- বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ থেকে।
- ময়না তদন্তে প্রাপ্ত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন থেকে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা–
  - ♦ তীব্র প্রকৃতির রোগে পাখির যকৃত, প্লীহা ও বৃক্ক আয়তনে বেড়ে যায় ও লালচে রঙ ধারণ করে।
  - ♦ কম তীব্র ও দীর্ঘ মেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে যকৃতের বর্ণ পরিবর্তিত হয়।
- গবেষণাগারে জীবাণু শণাক্তকরণের মাধ্যমে এ রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

টাইফয়েড রোগের চিকিৎসা পুলোরাম রোগেই মতোই।

এ রোগের চিকিৎসা পুলোরাম রোগেই মতোই। তবে, নিম্নলিখিত ওষুধ এ রোগ নিরাময়ে ভালো ভূমিকা রাখে। যথা–

- ফুরালটাডোন ৩০% সবচেয়ে ভালো ওষুধ। এ ওষুধ ১ গ্রাম/২ লিটার মাত্রায় পানির সঙ্গে মিশিয়ে ৩–৫ দিন আক্রান্ত পাখিকে পান করাতে হবে।
- এছাড়া অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ ও দমন

টাইফয়েড রোগের প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা পুলোরাম রোগের মতোই। এ রোগ প্রতিরোধে সালমোনেলা লাইভ ও ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকা ব্যবহার করা যায়।

এ রোগের প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা পুলোরাম রোগের মতোই। তবে, এ রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের টিকা পাওয়া যায়। যেমন–

- সালমোনেলা লাইভ টিকাবীজ– হল্যান্ডের ইন্টারভেট কোম্পানির তৈরি নবিলিস এসজি ৯ আর (Nobilis SG 9R) নামের এ জীবিত টিকাবীজ খুবই কার্যকর। ৬ ও ১৬ সপ্তাহ বয়সে এ টিকা প্রয়োগ করতে হয়। এ টিকা ০.২ মি.লি. মাত্রায় রানের মাংসে ইনজেকশন দিতে হয়।
- সালমোনেলা ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকাবীজ– মহাখালীস্থ প্রাণিসম্পদ গবেষণাগারে প্রস্তুত এ নির্জীব (Inactivated) টিকা ১ মি.লি. মাত্রায় পাখির চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ পুলোরাম ও ফাউল টাইফয়েড রোগের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ ছক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।*

সারমর্ম ঃ ফাউল টাইফয়েড মুরগি ও অন্যান্য পাখির একটি সেপ্টিসেমিক রোগ। এ রোগে সাধারণত ৩ মাস থেকে ডিমপাড়া পর্যন্ত বয়সের মুরগি আক্রান্ত হয়। এ রোগে মৃত্যুহার প্রায় ২০–৮০%। *Salmonella gallinarum* নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। বাহক ও আক্রান্ত পাখির মল, অন্যান্য নিঃসরণের মাধ্যমে দুষিত খাদ্য, লিটার, পানি, বাতাস দুষণের মাধ্যমে, ডিমের মাধ্যমে, বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ এবং মানুষের মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। ডিমের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে। বাড়ন্ত ও বয়স্ক মুরগিতে অতিতীব্র, তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত পাখি সবুজ বা হলুদ রঙের পায়খানা করে যা মলদ্বারের আশেপাশের পালকে লেগে থাকে। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা হয়। পুলোরাম রোগের ন্যায় এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। তবে, এ রোগে ফুরালটাডোন ৩০% ভালো কাজ করে। রোগপ্রতিরোধের জন্য কার্যকর টিকা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ফাউল টাইফয়েডে আক্রান্ত মুরগিতে কী রঙের ডায়রিয়া হয়?

i) সাদা
ii) সবুজ
iii) হলুদ
iv) সবুজ বা হলুদ

খ. ফাউল টাইফয়েডে আক্রান্ত পাখিতে মৃত্যুহার কত হতে পারে?

i) ১০–৫০%
ii) ১৫–২৫%
iii) ২৫–৬০%
iv) ২০–৮০%

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ফাউল টাইফয়েডের জীবাণুর নাম *Salmonella gallinatum*।
খ. ফাউল টাইফয়েড রোগ ডিমবাহিত।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ প্রকৃতির ফাউল টাইফয়েডে পাখি হঠাৎ মারা যায়।
খ. সালমোনেলা লাইভ টিকাবীজ _____ মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. তীব্র প্রকৃতির ফাউল টাইফয়েড রোগে মুরগির যকৃত ও প্লীহা কেমন দেখায়?
খ. ফাউল টাইফয়েডের দু'টো টিকার নাম লিখুন?

পাঠ ৩.৪ সংক্রামক সর্দি বা করাইজা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সংক্রামক সর্দি বা করাইজা কী তা বলতে পারবেন।
- করাইজা রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- করাইজা রোগ নির্ণয় করতে পারবেন এবং এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ আলোচনা করতে পারবেন।

করাইজা মুরগির শ্বাসতন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এতে বয়স্ক মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়।

সংক্রামক সর্দি বা ইনফেকশাস করাইজা (Infectious Coryza) মুরগির শ্বাসতন্ত্রের একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। সব বয়সের মুরগি এতে আক্রান্ত হলেও সাধারণত বয়স্কগুলোই বেশি আক্রান্ত হয়। উন্নত জাতের মুরগি এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। নাসারন্ধ্র ও সাইনাসপ্রদাহের (Sinusitis) কারণে মুরগির মুখমন্ডল ফুলে যাওয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগকে রোপ (Roup), ইনফেকশাস ক্যাটার (Infectious Catarrh), ঠান্ডা লাগা (Cold), আনকমপ্লিকেটেড করাইজাও (Uncomplicated Coryza) বলে। এ রোগে ১০০% পাখি আক্রান্ত হতে পারে, তবে মৃত্যুহার আনুপাতিক হারে অনেক কম।

কারণ

Haemophilus gallinarum (হিমোফিলাস গ্যালিনেরাম) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র দন্ডাকৃতির বা কক্কোব্যাসিলাই (Coccobacilli) ব্যাকটেরিয়ার এ, বি ও সি টাইপ এ রোগ সৃষ্টি করে। এ ব্যাকটেরিয়াটি গ্রাম নেগেটিভ, নড়ন অক্ষম ও পোলার স্পোরযুক্ত।

সংক্রমণ পদ্ধতি

আক্রান্ত মুরগির সরাসরি স্পর্শ, শ্লেষ্মার স্নারা দুষিত খাদ্য ও পানি, বাতাস প্রভৃতির মাধ্যমে করাইজা ছড়ায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হয়। যথা–

- আক্রান্ত মুরগি সুস্থ মুরগির সংস্পর্শে আসলে।
- কলুষিত শ্লেষ্মার স্নারা দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে।
- পাশাপাশি অবস্থিত মুরগির ঘরে বাতাসের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

করাইজায় আক্রান্ত পাখির লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হলো মুখমন্ডল ও চোখ ফুলে যাওয়া, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরা, কাঁশি, ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া ও শ্বাসকষ্ট।

করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- মুখমন্ডল ও মাথা ফুলে যায়।
- নাকমুখ দিয়ে পানি ঝরে।
- অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ হয়। চোখ ফুলে যায় ও আঠাযুক্ত হয়।
- গলার ফুল বিবর্ণ হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে।
- খাদ্য ও পানি পান করা বন্ধ হয়ে যায়।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে।
- কাঁশি হয় ও গলা দিয়ে ঘড়ঘর শব্দ বেরোয়।
- শ্বাসকষ্ট হয়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।
- লক্ষণ প্রকাশের ২–৩ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত পাখি মারা যেতে পারে।

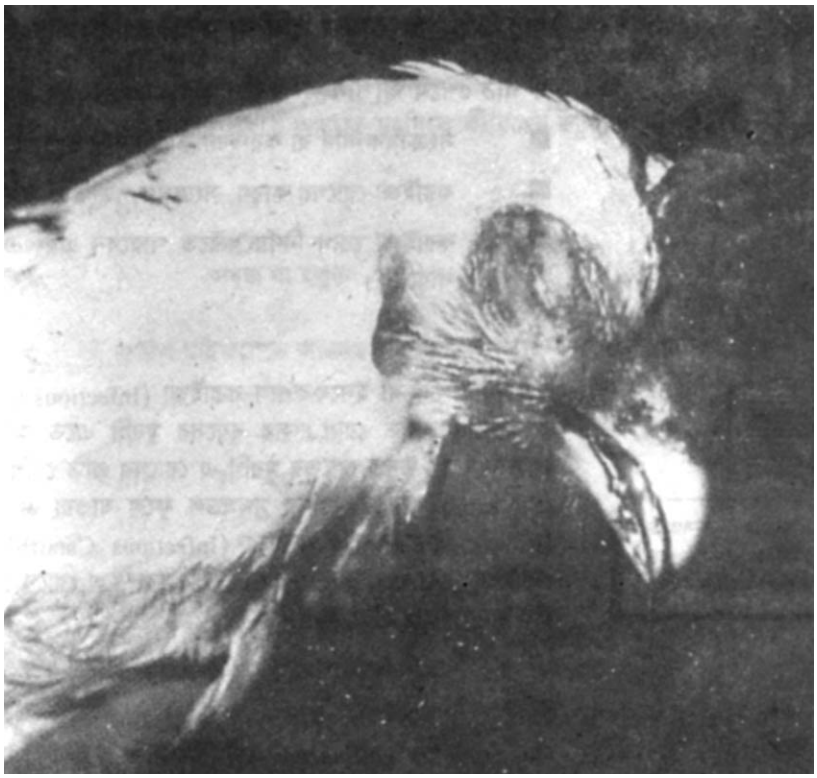

চিত্র ২৪ ঃ করাইজা বা সংক্রামক সর্দি রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে মুরগির করাইজা রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে পাখির বিভিন্ন অঙ্গের প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। যেমন–
  - ♦ নাকের ঝিল্লিপর্দা ও সাইনাসের শ্লৈষ্মিক প্রদাহ থাকে।
  - ♦ অক্ষিঝিল্লির প্রদাহ এবং মুখমন্ডল ও গলার ফুল ফোলা থাকে।
- কালচার করে জীবাণু শণাক্ত করে।

চিকিৎসা

সালফোনেমাইড ও অ্যান্টি-বায়োটিক দিয়ে করাইজার চিকিৎসা করা হয়।

সালফোনেমাইড এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। যেমন–

- খাদ্যের সঙ্গে সালফাডাইমিথোক্সিন ও সালফাথায়াজল ৫–৭ দিন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে পুণঃচিকিৎসা দিতে হবে।
- তাড়াতাড়ি সুফল পেতে হলে ভেটেরিনারি সার্জনের নির্দেশিত মাত্রায় স্ট্রেপটোমাইসিন ইনজেকশন ও খাদ্যের সঙ্গে সালফোনেমাইড ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগপ্রতিরোধ

রোগপ্রতিরোধের জন্য খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা, একদিন বয়সের বাচ্চা কিনে পালন ও টিকা প্রদান অপরিহার্য।

নিম্নলিখিতভাবে সংক্রামক করাইজা রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।
- যেহেতু এ রোগ থেকে সেরে ওঠা পাখি রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে তাই পালনের জন্য বয়স্ক মুরগি না কিনে একদিন বয়সের বাচ্চা কেনা উচিত।

- টিকার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য ইনঅ্যাকটিভেটেড ইনফেকশাস করাইজা টিকা ব্যবহার করা হয়। নেদারল্যান্ডের ইন্টারভেট কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত এ টিকার নাম নভি-ভ্যাক করাইজা (Novi-Vac Coryza)। প্রতিটি পাখির পেশি বা ত্বকের নিচে ০.৫ মি.লি. মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা হয়। প্রথমবার ৬ সপ্তাহ বয়সে ও দ্বিতীয়বার ৪ সপ্তাহ বয়সে টিকা প্রদান করলে ৮ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশে করাইজার কোনো টিকা প্রস্তুত হয় না।

অনুশীলন (Activity) *ঃ সংক্ষেপে ছক আকারে ইনফেকশাস করাইজা রোগের কারণ, সংক্রমণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ লিখুন।*

সারমর্ম ঃ সংক্রামক করাইজা মুরগির শ্বাসতন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াজনিত মারাত্মক রোগ। সব বয়সের মুরগি এতে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগের বিভিন্ন নাম রয়েছে। বয়স্ক মুরগি এতে বেশি আক্রান্ত হয়। *Haemophilus gallinarum* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। আক্রান্ত মুরগির সরাসরি স্পর্শ, শ্লেষ্মার স্নারা দুষিত খাদ্য ও পানি, বাতাস প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। এ রোগে আক্রান্ত পাখির লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হলো মুখমন্ডল ও চোখ ফুলে যাওয়া, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরা, কাঁশি ও ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া এবং শ্বাসকষ্ট। রোগের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়। চিকিৎসার জন্য সালফোনেমাইড ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। রোগপ্রতিরোধের জন্য খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা, একদিন বয়সের বাচ্চা কিনে পালন ও টিকা প্রদান অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. করাইজা রোগে কোন্ বয়সের মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়?

i) অল্প বয়সের মুরগি
ii) বয়স্ক মুরগি
iii) কোনোটিই নয়
iv) উপরের দু'টোই

খ. সংক্রামক করাইজা রোগের জীবাণুর নাম কী?

i) *Haemophilus influenza*
ii) *Haemophilus gallinarum*
iii) *Salmonella gallinarum*
iv) *Heterakis gallinarum*

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. করাইজা রোগের জীবাণু গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই।
খ. করাইজা রোগে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির লক্ষণ দেখা যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগির মুখমন্ডল ও মাথা _____ যায়।
খ. করাইজা রোগে _____ প্রদাহ থাকে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. করাইজা রোগের বিভিন্ন নাম লিপিবদ্ধ করুন।
খ. কোন্ বয়সে করাইজার টিকা দিতে হয়?

পাঠ ৩.৫ মাইকোপ্লাজমোসিস

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাখির মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগগুলোর নাম ও কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সি.আর.ডি. ও ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগের সংক্রমণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সি.আর.ডি. ও ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগ নির্ণয় পদ্ধতি বলতে পারবেন এবং এ দু'টো রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

অ্যাভিয়ান মাইকোপ্লাজমোসিস

মাইকোপ্লাজমা জীবাণু পাখিতে যেসব রোগ সৃষ্টি করে সেগুলোকে মাইকোপ্লাজমোসিস বলে।

মাইকোপ্লাজমা গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু পাখিতে যেসব রোগ সৃষ্টি করে সেগুলোকে একত্রে পাখির মাইকোপ্লাজমোসিস বা অ্যাভিয়ান মাইকোপ্লাজমোসিস (Avian Mycoplasmosis) রোগ বলে। যেমন– ক্রনিক রেসপাইরেটরি ডিজিজ বা সি.আর.ডি. ও ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস। এ পাঠে এ দু'টো রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সি.আর.ডি (CRD)

সি.আর.ডি. মুরগির শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির মাইকোপ্লাজমা-জনিত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও জাতের মুরগি এতে আক্রান্ত হতে পারে।

ক্রনিক রেসপাইরেটরি ডিজিজ বা সি.আর.ডি. মুরগির শ্বাসতন্ত্রের এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির মাইকোপ্লাজমাজনিত ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়স ও জাতের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, প্রধানত ৪–৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এতে বেশি আক্রান্ত হয়। ব্রয়লার মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এ বয়সে মৃত্যু হার ৩০–৪০% এ পৌঁছুতে পারে। বয়স্ক পাখি রোগাক্রান্ত হলে প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগের সঙ্গে অন্যান্য রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে তা আরও জটিল আকার ধারণ করে। পৃথিবীর সকল পোল্ট্রি পালনকারী দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

রোগের কারণ

Mycoplasma gallisepticum (মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম) নামক মাইকোপ্লাজমা জীবাণু এ রোগের কারণ।

সংক্রমণ পদ্ধতি

সরাসরি সংস্পর্শ, বাতাস, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো, খাদ্য, খাদ্যের বস্তা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং ডিমের মাধ্যমে সি.আর.ডি. সুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হয়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ ছড়াতে পারে। যথা–

- আক্রান্ত মুরগির ডিমের মধ্যে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়ে থাকে। জীবাণু আক্রান্ত এ ডিম ফোটানোর জন্য ব্যবহার করলে বাচ্চার মধ্যে এ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে।
- একই খামারে বিভিন্ন মুরগির ঝাঁকের মধ্যে বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।
- পরিচর্যাকারীর ব্যবহৃত জামা-জুতো, খাদ্যের বস্তা, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ পাখিতে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।
- অসুস্থ পাখির সংস্পর্শে সুস্থ মুরগি আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাখিতে সি.আর.ডি. সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। যথা–

- অন্যান্য কারণে শ্বাসতন্ত্রের রোগ দেখা দিলে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডা।
- মুরগির ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচল কম থাকলে।
- ব্যাকটেরিয়া, যেমন– *Escherichia coli* এর সংক্রমণ ঘটলে।
- জীবিত টিকা ব্যবহারের ফলে প্রতিক্রিয়া ঘটলে।

লক্ষণ

কাশি, নাকমুখ দিয়ে পানি পড়া, শ্বাসনালি থেকে ঘড়ঘড় শব্দ, ক্ষুধামন্দা, ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি সি.আর.ডি. এর লক্ষণ।

মুরগির দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোগ বা সি.আর.ডি. তে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- নাক দিয়ে সবসময় পানি ঝরে। কখনো কখনো মুখ দিয়েও পানি পড়ে।
- শ্বাসনালি থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হয়।
- ঠোঁট অল্প ফাঁক করে ছোট ছোট নিঃশ্বাস নেয়।
- ফোটানোর ডিমের ক্ষেত্রে ডিমের ভিতর বাচ্চার মৃত্যু ঘটে।
- ক্ষুধামন্দা হয় ও মুরগি ঝিমায়।
- ওজন হ্রাস পায়।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায়।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, লক্ষণ, র‍্যাপিড প্লেট অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্টের ফল, ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের প্রভৃতির মাধ্যমে সি.আর.ডি নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে সি.আর.ডি. নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ দেখে।
- র‍্যাপিড প্লেট অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্টের (Rapid Plate Agglutination Test) মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কাঁচের পাইডে ১ ফোটা অ্যান্টিজেন ও এক ফোটা আক্রান্ত মুরগির রক্ত নিয়ে কাঠি দিয়ে ১ মিনিট নাড়লে রক্ত ও অ্যান্টিজেন মিলে দানা দানা সৃষ্টি হবে।
- ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেমন–
  - সাইনাস, শ্বাসনালি, ক্লোমনালি ও বায়থুলিতে শ্লৈষ্মিক নিঃস্রাব থাকে।
  - অনেক সময় নিউমোনিয়ার ক্ষত দেখা যায়।
  - মুরগির ডিম্বনালিতে প্রদাহের চিহ্ন থাকে।
  - হৃৎপিন্ডে পেরিকার্ডাইটিসের চিহ্ন দেখা যায়।

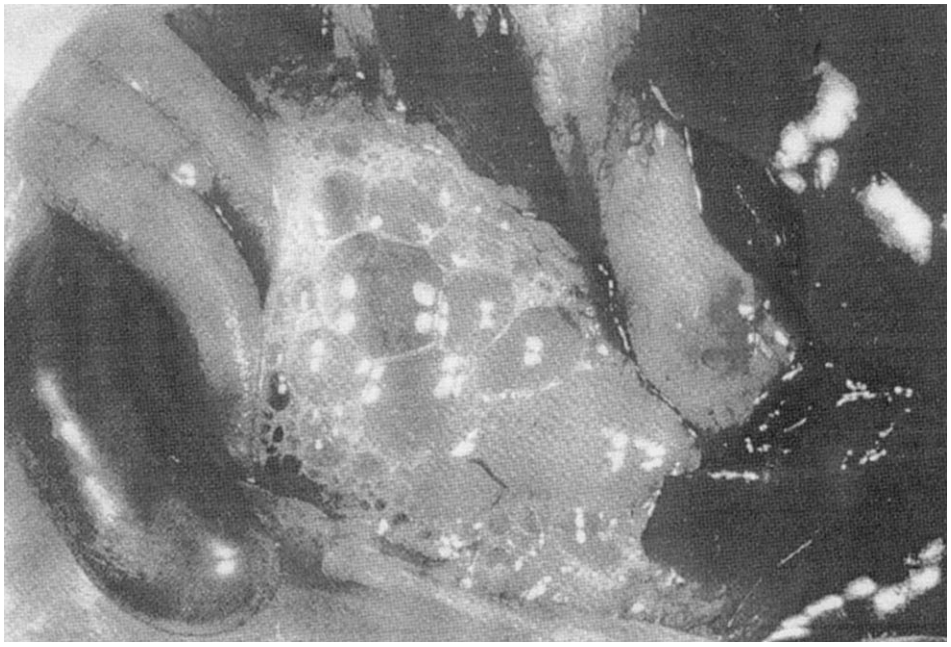

চিত্র ২৫ ঃ সি.আর.ডি.তে আক্রান্ত পাখির বায়ুথলির ক্ষত

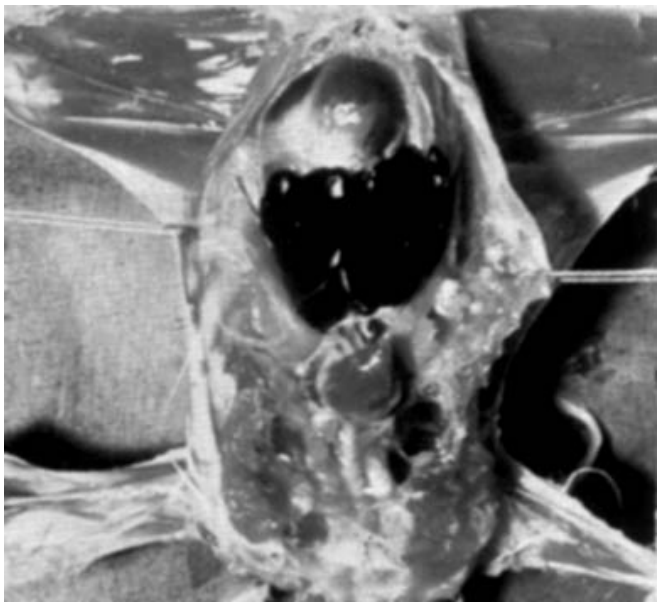

চিত্র ২৬ ঃ সি.আর.ডি.তে আক্রান্ত পাখির বায়ুথলিতে প্রদাহের চিহ্ন

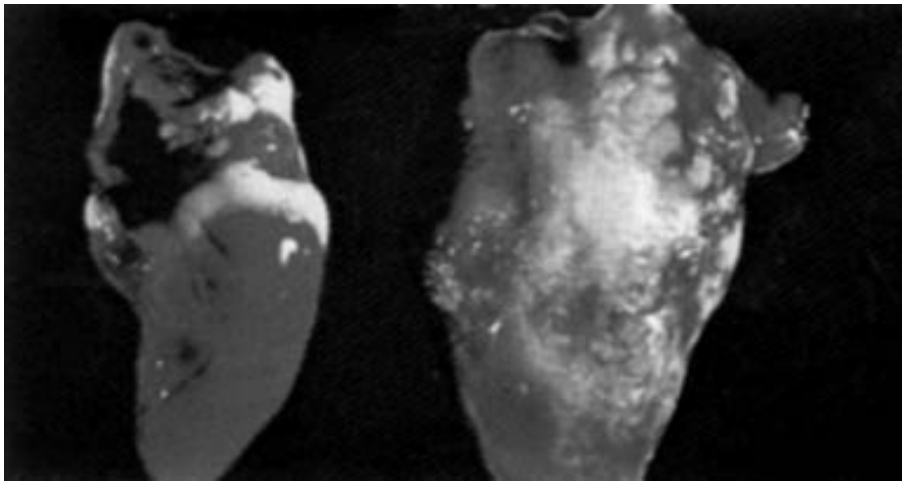

চিত্র ২৭ ঃ সি.আর.ডি.তে আক্রান্ত পাখির পেরিকার্ডাইটিস

চিকিৎসা

মুরগির সি.আর.ডি. চিকিৎসায় টাইলোসিন টারট্রেট বা ডাই-হাইড্রোস্ট্রেপটোমাইসিন নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিতভাবে ওষুধ দিয়ে সফলভাবে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। যথা–

- টাইলোসিন টারট্রেট ১ গ্রাম/লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।
- ডাই-হাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।
- এছাড়াও নির্ধারিত মাত্রায় অক্সি বা ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন, ফুরাজোলিডন ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

খামারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে ও টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে সি.আর.ডি. নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- খামারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রেখে রোগজীবাণু সংক্রমণের পথ বন্ধ করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- প্রতিরোধক মাত্রায় চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খাদ্যের সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খাওয়ানোর মাধ্যমে।
- টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধে দুধরনের টিকা প্রয়োগ করা যায়। যথা–
  - ♦ জীবন্ত টিকা (Live Vaccine)– নেদারল্যান্ডের ইন্টারভেট কোম্পানির নবিলিস এমজি ৬/৮৫ (Nobilis MG 6/85) জীবন্ত টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সঙ্গে মিশিয়ে ৬ সপ্তাহ বয়সে মুরগির চোখে ফোটা হিসেবে দিতে হয়। ৩–৪ সপ্তাহ পরে একইভাবে পুনরায় টিকা প্রয়োগ করতে হয়।
  - ♦ নিষ্ক্রিয় টিকা (Inactivated Vaccine)– ইন্টারভেট কোম্পানির তৈরি নভি-ভ্যাক এমজি (Novi-Vac MG) মৃত টিকা তরল অবস্থায় সরবরাহ করা হয়। এ তরল টিকা ০.৫ মি.লি. করে প্রতিটি মুরগির ঘাড়ের পিছনের চামড়ার নিচে ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে সি.আর.ডি. রোগের টিকা তৈরি হয় না।

ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস

ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগে পাখির অস্থিসন্ধির সাইনোভিয়াল পর্দা এবং টেন্ডন আবরক আক্রান্ত হয়।

ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস (Infectious Synovitis) মুরগি ও টার্কি পাখির একটি তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ। এ রোগে অস্থিসন্ধির সাইনোভিয়াল পর্দা (Synovial Membrane) এবং টেন্ডন আবরক (Tendon Sheath) আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্তের হার ২–৭৫% ও মৃত্যুহার ১–১০% হতে পারে।

কারণ

Mycoplasma synoviae (মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি) নামক এক ধরনের মাইকোপ্লাজমা জীবাণু এ রোগ সৃষ্টি করে।

সংক্রমণ পদ্ধতি

ইনফেকশাস সাইনোভাইটিসে পাখির বিভিন্ন অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হয়।

এ রোগের জীবাণু নিম্নলিখিতভাবে সংক্রমিত হয়। যথা–

- আক্রান্ত মুরগির ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় সংক্রমিত হয়।
- সরাসরি সংস্পর্শে এবং বাতাসের মাধ্যমে অসুস্থ পাখি থেকে সুস্থ পাখিতে জীবাণু ছড়ায়।
- পরিচর্যাকারীর ব্যবহৃত জামা-জুতো, খাদ্য, খাদ্যের বস্তা, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে।

লক্ষণ

ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগে অস্থিসন্ধি ফোলা, খোঁড়ানো ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

এ রোগে আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- আক্রান্ত মুরগির মাথার ফুল ফ্যাকাশে দেখায়।
- এদের মধ্যে খোঁড়ানোর লক্ষণ দেখা যায় ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- মাথার ফুল সংকুচিত হয় ও পালক কুঁচকে যায়।
- অস্থিসন্ধি, বিশেষ করে হক সন্ধি (Hock Joint) এবং পায়ের তালু (Foot Pad) ফুলে উঠে। কোনো কোনো পাখির একাধিক অস্থিসন্ধিও আক্রান্ত হয়।
- পাখি ইউরেটযুক্ত সবুজ রঙের মল ত্যাগ করে।
- শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হলে মৃদু শ্বাসীয় শব্দ হয়।
- পাখিতে সাইনোভিয়াপ্রদাহ (Synovitis) পাঁচ বছর পর্যন্ত থাকতে পারে।

চিত্র ২৮ ঃ ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগে আক্রান্ত মুরগির হক সন্ধি

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস, লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন, জীবাণু কালচার প্রভৃতির মাধ্যমে ইনফেকশাস সাইনুভাইটিস রোগ নির্ণয় করা যায়।

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ময়না তদন্তে প্রাপ্ত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের মাধ্যমে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন হতে পারে। যথা–
  - ♦ প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত অস্থিসন্ধি, বার্সা ও টেন্ডন আবরকের সাইনোভিয়াল পর্দায় ধূসর রঙের থকথকে নিঃস্রাব থাকে যা পরবর্তী পর্যায়ে পানির রূপ ধারণ করে।
  - ♦ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অস্থিসন্ধির উপরিভাগ হলুদ থেকে বাদামি রঙ ধারণ করে।
  - ♦ যকৃত, প্লীহা ও বৃক্ক আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও ক্ষত দেখা যায়।
- কালচারের মাধ্যমে জীবাণু পৃথক ও শণাক্ত করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

ভেটেরিনারি সার্জনের পরমর্শমতো ইনফেকশাস সাইনুভাইটিস রোগের চিকিৎসা করা যায়।

ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা ডাই-হাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন নামক অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়।

প্রতিরোধ

রোগপ্রতিরোধের জন্য খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

- এ রোগের প্রতিরোধের জন্য খামারে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- প্রজননের কাজে ব্যবহৃত মুরগি জীবাণু ও রোগমুক্ত রাখতে হবে।
- প্রতিরোধক মাত্রায় মুরগিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ সি.আর.ডি. এবং ইনফেকশাস সাইনোভাইটিসের মধ্যকার পার্থক্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন।*

সারমর্ম ঃ দীর্ঘস্থায়ী শ্বাস রোগ বা সি.আর.ডি. এবং ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস পাখির, বিশেষ করে মুরগির, মাইকোপ্লাজমাজনিত ছোঁয়াচে রোগ। *Mycoplasma gallisepticum* এবং *Mycoplasma synovae* যথাক্রমে এ দু'টো রোগ সৃষ্টি করে। সরাসরি সংস্পর্শ, বাতাস, পরিচর্যাকারীর জামা-জুতো, খাদ্য, খাদ্যের বস্তা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং ডিমের মাধ্যমে এ রোগ দু'টো অসুস্থ পাখিতে সংক্রমিত হয়। সি.আর.ডি.তে প্রধানত পাখির শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হয়। কাশি, নাকমুখ দিয়ে পানি পড়া, শ্বাসনালি থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়া, ক্ষুধামন্দা, ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি সি.আর.ডি. রোগের লক্ষণ। ইনফেকশাস সাইনোভাইটিসে বিভিন্ন অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হওয়া, অস্থিসন্ধি ফোলা, খোঁড়ানো ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন, জীবাণু কালচার প্রভৃতির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত মাত্রায় টাইলোসিন টারট্রেট, অক্সি বা ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন, ডাই-হাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। রোগপ্রতিরোধের জন্য খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। প্রজননে ব্যবহৃত মুরগি জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। প্রতিরোধক মাত্রায় ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া সি.আর.ডি. প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. সি.আর.ডি.তে প্রধানত কত সপ্তাহ বয়সের মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়?

i) ১–২ সপ্তাহ
ii) ২–৪ সপ্তাহ
iii) ৪–৬ সপ্তাহ
iv) ৪–৮ সপ্তাহ

খ. ইনফেকশাস সাইনোভাইটিসে মৃত্যুহার কত হতে পারে?

i) ১–১০%
ii) ২–২০%
iii) ৩–৩০%
iv) ৪–৪০%

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাতাসের মাধ্যমে *Mycoplasma* জীবাণু ছড়াতে পারে।
খ. মাইকোপ্লাজমোসিস ডিমবাহিত রোগ নয়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. *Mycoplasma* _____ সি.আর.ডি. সৃষ্টি করে।
খ. র‍্যাপিড প্লেট _____ টেস্টের মাধ্যমে সি.আর.ডি. নির্ণয় করা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. সি.আর.ডি. এর টিকাগুলো কী কী?
খ. ইনফেকশাস সাইনোভাইটিসে পাখির কী আক্রান্ত হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৩.৬ ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে কলেরার লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ছবি বা রোগাক্রান্ত পাখি দেখে কলেরা রোগ শণাক্ত করতে পারবেন।
- কলেরা রোগের লক্ষণগুলো খাতায় লিখতে ও বলতে পারবেন।

ফাউল কলেরা হাঁসমুরগি এবং অন্যান্য পাখির ব্যাকটেরিয়াজনিত মারাত্মক রোগ। উচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যুহার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

হাঁসমুরগির কলেরা বা ফাউল কলেরা হাঁসমুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত ও বুনো পাখির একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। উচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যু হার এবং ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব বয়সের পাখি এতে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁসমুরগির ঘর স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটি থাকলে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। কলেরা রোগ সম্পর্কে পাঠ ৩.১ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত মুরগির ছবি এ পাঠ ছাড়াও পাঠ ৩.১ এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এ বইয়ে সংযোজিত রঙিন প্লেটে আক্রান্ত পাখির রঙিন ছবি (রঙিন চিত্র ১৮–১৯) দেয়া হয়েছে। পাঠ ৩.১ ভালোভাবে পড়ুন এবং ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

উপকরণ

১. কলেরা রোগে আক্রান্ত পাখির ছবি বা সম্ভব হলে একটি আক্রান্ত মুরগি বা হাঁস।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

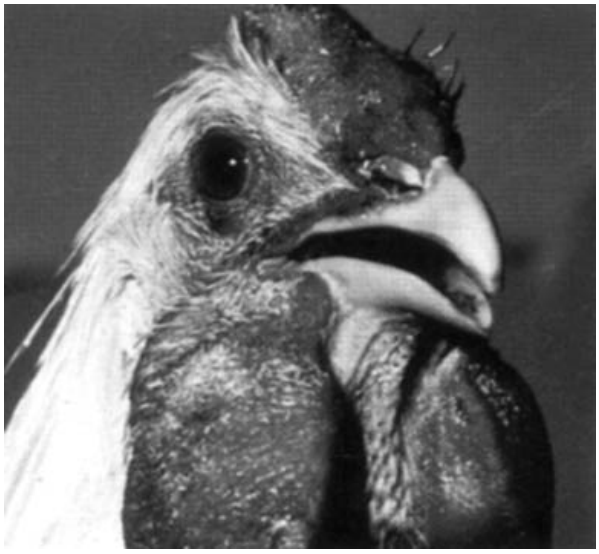

চিত্র ২৯ ঃ কলেরায় আক্রান্ত মোরগের ফোলা মাথা ও গলার ফুল

কাজের ধারা

- প্রথমে রোগাক্রান্ত হাঁসমুরগি বা এদের ছবি আপনার সামনে নিয়ে আসুন।
- কলেরা আক্রান্ত পাখির মালিক বা পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে রোগের ইতিহাস জেনে নিন।
- এবার আক্রান্ত পাখি বা ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুণ ও এর শারীরিক অবস্থা বা দৈহিক পরিবর্তনগুলো নোট করুন।

- আপনার দেখা পরিবর্তনগুলোর সাথে পাঠ **৩.১** এ পড়া রোগলক্ষণগুলো মিলিয়ে নিন ।
- প্রয়োজনে আপনার কোনো সহপাঠির সঙ্গে আলোচনা করে রোগলক্ষণ শণাক্ত করুন ।
- এবার এ লক্ষণগুলো থেকে কলেরা রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হোন ।
- পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং কলেরা রোগের লক্ষণগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন । প্রয়োজনে ছবি আঁকুন ।
- ব্যবহারিক খাতা টিউটরকে দেখান ও সই নিন ।

সাবধানতা

- আক্রান্ত পাখি বা ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা কী? এদের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।
২। মুরগি ও হাঁসের কলেরা রোগের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।
৩। পুলোরাম ও ফাউল টাইফয়েড রোগের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করুন।
৪। সংক্ষেপে পুলোরাম রোগের দমন পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৫। মুরগির টাইফয়েড রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
৬। চারটি ডিমবাহিত রোগ ও আক্রান্তকারী জীবাণুর নাম লিখুন।
৭। সংক্রামক সর্দি বা করাইজা কী? এ রোগের অন্যান্য নাম লিখুন।
৮। করাইজা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করুন।
৯। অ্যাভিয়ান মাইকোপ্লাজমোসিস কী? সি.আর.ডি. এর লক্ষণ বর্ণনা করুন।
১০। সি.আর.ডি. ও ইনফেকশাস সাইনোভাইটিস রোগের প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ লিখুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। ক. iv ১। খ. ii ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. মৃত ৩। খ. সাদা
৪। ক. রক্তক্ষরণ ও রক্তাধিক্য ৪। ৭৫ দিন বয়সে প্রথম ডোজ এবং ৯০ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ

পাঠ ৩.২

১। ক. iv ১। খ. i ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. সেপ্টিসেমিক ৩। খ. ডিমের
৪। ক. ব্যাসিলারি হোয়াইট ডায়রিয়া বা সাদা পায়খানা ৪। খ. খামারে কঠোরভাবে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা মেনে চলার মাধ্যমে

পাঠ ৩.৩

১। ক. iv ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. স ৩। ক. অতিতীব্র ৩। খ. ০.২ মি.লি. ৪। ক. আয়তনে বেড়ে যায় ও লালচে রঙের দেখায় ৪। খ. সালমোনেলা লাইভ টিকা, যেমন– নবিলিস এসজি ৯ আর এবং সালমোনেলা ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকা

পাঠ ৩.৪

১। ক. ii ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. ফুলে ৩। খ. অক্ষিঝিল্লির
৪। ক. রোপ, ইনফেকশাস ক্যাটার, ঠান্ডা লাগা ও আনকমপ্লিক্যাটেড করাইজা ৪। ১২ ও ১৬ সপ্তাহ বয়সে

পাঠ ৩.৫

১। ক. iv ১। খ. i ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. *gallisepticum* ৩। খ. অ্যাগ্লুটিনেশন ৪। ক. নবিলিস এম জি ৬/৮৫ ও নভি-ভ্যাক এমজি ৪। ক. অস্থিসন্ধির সাইনোভিয়াল পর্দা ও টেন্ডন আবরক

ইউনিট ৪
পোল্ট্রির
পরজীবীজনিত রোগ

ইউনিট ৪ পোল্ট্রির পরজীবীজনিত রোগ

পরজীবী বা প্যারাসাইট (Parasite) এক ধরনের জীব যা অন্য জীব অর্থাৎ মানুষসহ পশুপাখির দেহে বসবাস করে জীবনধারণ করে। যে জীবের দেহের উপর এরা জীবনধারণ করে তাদেরকে হোস্ট (Host) বা পোষক বলে। কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃপরজীবী (Internal Parasite) বলে। আবার কিছু পরজীবী আছে যারা পোষকের দেহের বাইরের অঙ্গে বসবাস করে ক্ষতিসাধন করে। এদেরকে বহিঃদেহের পরজীবী বা বহিঃপরজীবী (External Parasite) বলে। উভয় ধরনের পরজীবীর আক্রমণের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরা পাখির দেহে বাস করে পাখি কর্তৃক খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য নিজেরা খেয়ে ফেলে, ফলে আক্রান্ত পোল্ট্রি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক পরজীবী আছে যারা পাখির দেহে বাস করে রক্ত শুষে নেয়, ফলে আক্রান্ত পাখির দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। যে কোনো পরজীবী দ্বারা পাখি আক্রান্ত হোক না কেন, এদের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত পাখির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায়। এছাড়াও এক ধরনের পরজীবী আছে যারা আক্রান্ত পাখির দেহ থেকে সুস্থ পাখির দেহে সংক্রামক রোগের জীবাণু সংক্রমিত করে থাকে। কাজেই পোল্ট্রি শিল্প থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে হলে পরজীবীজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ অপরিহার্য।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পোল্ট্রির দেহাভ্যন্তরের সাধারণ পরজীবী, বহিঃদেহের সাধারণ পরজীবী, প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ দেহাভ্যন্তরের সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির দেহাভ্যন্তরের পরজীবীগুলোর নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পরজীবী আক্রান্ত পোল্ট্রিতে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- দেহাভ্যন্তরের পরজীবীজনিত রোগের প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা বিশদভাবে আলোচনা করতে পারবেন।

পোল্ট্রির দেহে অন্তঃপরজীবীর আক্রমণ নির্ভর করে পোল্ট্রির পালন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর।

দেহাভ্যন্তরের পরজীবী

পোল্ট্রির দেহে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃপরজীবীর আক্রমণ নির্ভর করে পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধির ওপর। পোল্ট্রির বাসস্থান যদি স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং পালন ব্যবস্থাপনা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, তাহলে এ ধরনের পরজীবীর আক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়। ব্রয়লার মুরগিতে এদের আক্রমণ নেই বললেই চলে। কারণ, ব্রয়লার মুরগি খুব অল্প সময়ের জন্য প্রতিপালন করা হয়। খাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে সাধারণত পরজীবীর আক্রমণ খুব কম হয়। যাহোক, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রিতে এদের আক্রমণ এতো বেশি হয় যে তা পোল্ট্রি শিল্পের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

দেহাভ্যন্তরে পরজীবী আক্রমণের ফলে পোল্ট্রির দেহে যেসব ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় তা নিম্নরূপ–

- কোষ বা কলার গঠন নষ্ট হয়ে যায়।
- পোষকের খাদ্য খেয়ে ফেলার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।
- সংক্রামক রোগের জীবাণু ছড়ায়।
- খাদ্যনালি বন্ধ করে রাখে, ফলে আক্রান্ত পাখি মারা যায়।
- পরজীবী টক্সিন বা বিষ তৈরি করে যা পোষকের দেহের জন্য ক্ষতিকর।
- ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমিক সংক্রমণ দেখা দেয়।

বিভিন্ন প্রজাতির দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বা অন্তঃপরজীবী মুরগির দেহ আক্রান্ত করতে পারে। এগুলোর মধ্যে আমাদের দেশে মুরগির গোলকৃমি (Roundworm) এবং ফিতাকৃমির (Tapeworm) আক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

Ascaridia galli হচ্ছে মুরগির বড় গোলকৃমি যা ক্ষুদ্রান্ত্র আক্রান্ত করে।

বড় গোলকৃমি (Large Roundworms)

Ascaridia galli (অ্যাসক্যারিডিয়া গ্যালি) হচ্ছে মুরগির বড় গোলকৃমি যা ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) আক্রান্ত করে।

জীবনচক্র (Life Cycle)

পরিপক্ক স্ত্রী গোলকৃমি পোল্ট্রির ক্ষুদ্রান্ত্রে ডিম পাড়ে। কৃমির ডিম মুরগির মলের সাথে বের হয়ে আসে। বাইরের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার ফলে ডিমের মধ্যে কীড়া বা লার্ভা (Larva) জন্মায়। আস্তে আস্তে লার্ভা পরিপক্ক হয়। খাদ্য অথবা পানির সাথে পরিপক্ক লার্ভা মুরগির দেহে প্রবেশ করে। ২১ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে লার্ভা পরিপক্ক (Adult) কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

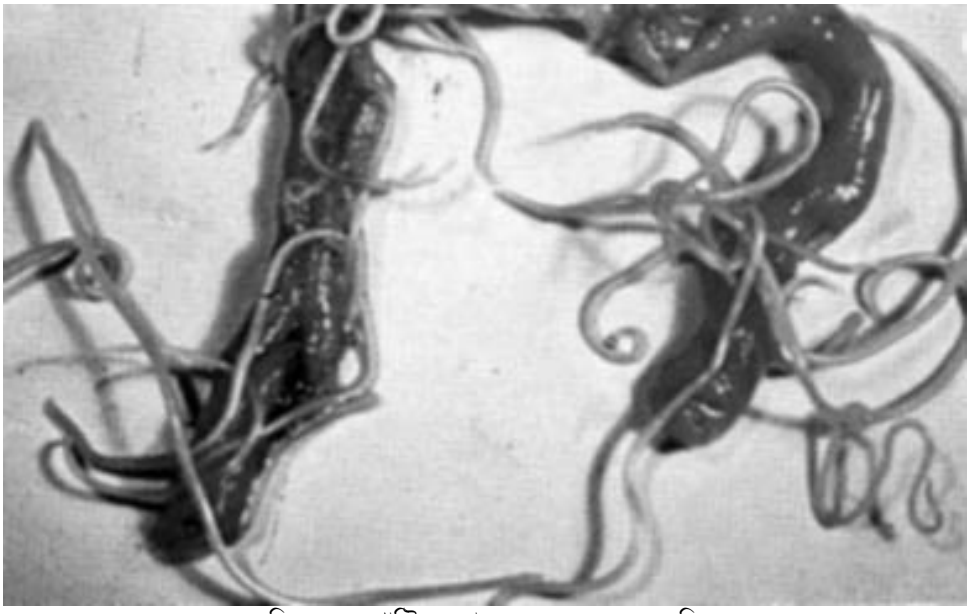

চিত্র ৩০ ঃ পোল্ট্রির ক্ষুদ্রান্ত্রে *Ascaridia galli* কৃমি

কৃমির বিস্তার

কৃমির লার্ভাসম্বলিত ডিমই হচ্ছে মারাত্মক।

একটি পরিপক্ক স্ত্রী কৃমি কয়েক হাজার ডিম দেয়। লার্ভাসম্বলিত ডিমই হচ্ছে মারাত্মক। পরিবেশের মধ্যে কৃমির ডিম কয়েক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের ব্যবহৃত জামা, জুতো, খামারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ডিম এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়াতে পারে। এরপর খাদ্য বা পানির মাধ্যমে এগুলো মুরগির দেহে সংক্রমিত হয়।

বড় গোলাকৃমির আক্রমণে মুরগির বৃদ্ধি হ্রাস পায়, পালক উসকোখুশকো হয়, পাতলা পায়খানা ও রক্তশূণ্যতা দেখা দেয় এবং ডিম উৎপাদন কমে যায়।

লক্ষণ

আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নে বর্ণিত লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে। যেমন–

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা।
- খাদ্য কম খাওয়া।
- পালক উসকোখুশকো হয়ে যাওয়া।
- পাতলা পায়খানা হওয়া।

- শরীর রুগ্ন হওয়া এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়া।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।

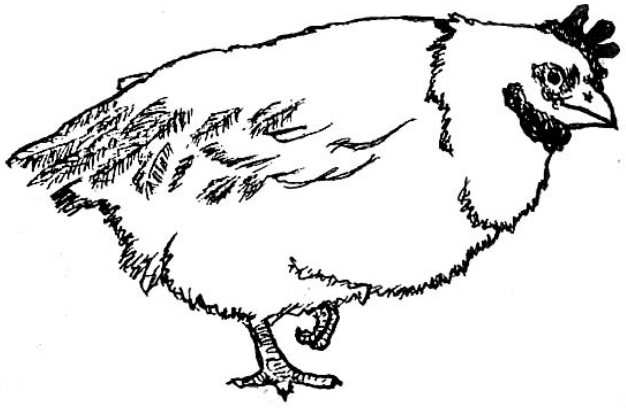

চিত্র ৩১ ঃ কৃমি আক্রান্ত বয়স্ক মুরগি

পাইপারজিন খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

পাইপারজিন গ্রুপের যে কোনো একটি কৃমিনাশক, যেমন– পাইপারজিন সাইট্রেট, পাইপারজিন অ্যাডিপেট বা পাইপারজিন ডাই-হাইড্রো-ক্লোরাইড খাদ্য বা পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে খালি পেটে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। কৃমিনাশক হিসেবে লেভামিজল ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চললে মুরগিতে গোলকৃমির আক্রমণ হবে না। যথা–

- নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করাতে হবে।
- সবসময় মুরগিকে সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- বাসস্থানের লিটার সবসময় শুষ্ক রাখতে হবে।
- বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগির সাথে বয়স্ক মুরগি পালন করা যাবে না।
- ঘরে মুরগি পালনের পূর্বে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে বাসস্থান ও আশেপাশের এলাকা ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির সাথে যাতে মুরগির পায়খানা না লাগতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছোট গোলকৃমি (Small Roundworms)

ছোট গোলকৃমি সাধারণত মুরগির খাদ্যনালির সিকামে বাস করে।

মুরগির ছোট গোলকৃমির নাম হচ্ছে *Heterakis gallinarum (হেটারেকিস গ্যালিনেরাম)*। এদেরকে সিকাল কৃমিও (Caecal Worm) বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কৃমি সাধারণত মুরগির খাদ্যনালির সিকাম নামক অংশে বাস করে।

জীবনচক্র (Life Cycle)

পায়খানার সাথে এ কৃমির ডিম বাইরে বের হয়ে আসে। বাইরের আবহাওয়ায় ডিম থেকে লার্ভা হয়। খাদ্য বা পানির সাথে মুরগির দেহে এ লার্ভা প্রবেশ করে। অতঃপর ৩–৪ সপ্তাহের মধ্যে মুরগির সিকামে এরা পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃমির বিস্তার

মানুষের ব্যবহৃত জামাকাপড়, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বন্য পশুপাখি প্রভৃতির মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কৃমির ডিমের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও এ কৃমির ডিম সুস্থ মুরগিতে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

ছোট গোল কৃমির আক্রমণে মুরগি বাদামি রঙের পাতলা পায়খানা করে।

ছোট গোলকৃমি আক্রমণের ফলে মুরগির দেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা হলো–

- বাদামি রঙের পাতলা পায়খানা হওয়া।
- ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া।
- খাদ্য খাওয়া কমে যাওয়া।
- ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া।
- পালক এলোমেলো ও উসকোখুশকো হয়ে যাওয়া।

চিকিৎসা

পাইপারজিন গ্রুপের যে কোনো একটি কৃমিনাশক খাদ্য বা পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

এ কৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা বড় গোলকৃমি প্রতিরোধের মতোই।

সুতাকৃমি (ঞযৎবধফড়িৎসং)

সুতাকৃমি হচ্ছে মুরগির এক ধরনের গোলকৃমি। এদেরকে চুলকৃমিও বলা হয়।

মুরগির সুতাকৃমি হচ্ছে *Capillaria (ক্যাপিলারিয়া)* গণের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েক প্রজাতির গোলকৃমি। এদেরকে চুলকৃমিও (Hairworms) বলা হয়। *Capillaria annulata (ক্যাপিলারিয়া অ্যানুল্যাটা)* মুরগির খাদ্যনালি বা ইসোফেগাস (Esophagus) ও খাদ্যথলি বা ক্রপে (Crop) এবং *Capillaria obsignata (ক্যাপিলারিয়া অবসিগন্যাটা)* ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাস করে। উভয় ধরনের কৃমির ডিমই মুরগির পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে। ডিমের মধ্যে লার্ভা জন্মায়। *Capillaria annulata* এর লার্ভাসম্বলিত ডিম কেঁচো খেয়ে ফেলে। কেঁচোর দেহের ভিতরে লার্ভা বৃদ্ধি লাভ করে। মুরগি যখন কেঁচো খায়, তখন কৃমির এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লার্ভা কেঁচোর দেহ থেকে মুরগির দেহে চলে আসে এবং পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হয়।

চিত্র ৩২ ঃ পোল্ট্রির খাদ্যনালিতে সুতাকৃমি

কৃমির বিস্তার

মানুষের ব্যবহৃত জামা, জুতো, খামারের যন্ত্রপাতি, কেঁচো ইত্যাদির মাধ্যমে কৃমির ডিম একস্থান হতে অন্যস্থানে বিস্তারলাভ করে। খাদ্য অথবা পানির মাধ্যমেও সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

সুতাকৃমির আক্রমণ তীব্র হলে মুরগি পাতলা পায়খানা করে, রক্তশূণ্যতা দেখা দেয় ও অবশেষে মারা যায়।

আক্রান্ত পাখির দেহে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–

- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- দৈহিক ওজন একেবারে কমে যায়।
- পালক উসকোখুশকো দেখায়।
- পাতলা পায়খানা হয়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- অবশেষে পাখি মারা যায়।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে আক্রান্ত পোল্ট্রির চিকিৎসা করা যায়। যথা–

- পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় লেভামিজল (Levamisole) মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- পাইপারজিন গ্রুপের কৃমিনাশকও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ

সুতাকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থা অন্যান্য গোলকৃমির প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতোই।

ফিতাকৃমি (Tapeworms)

হাঁসমুরগিতে অনেক ধরনের ফিতাকৃমি পাওয়া যায়। এরা অন্ত্রনালির গায়ে লেগে থাকে ও পোষকের খাদ্যে ভাগ

হাঁসমুরগির মধ্যে অনেক ধরনের ফিতাকৃমি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে *Raillietina tetragona (রেইলিয়েটিনা টেট্রাগোনা)* ও *Davainea proglottina (ডেভাইনিয়া প্রোগ্লোটিনা)* গুরুত্বপূর্ণ। এরা অন্ত্রনালির গায়ে লেগে থাকে ও হাঁসমুরগির খাদ্যে ভাগ বসায়।

জীবনচক্র (খরভব ঈুপষব)

হাঁসমুরগির মলের সাথে পরিণত বয়সের কৃমির অংশ বা সেগমেন্ট (Segment) বের হয়ে আসে। কৃমির সেগমেন্টের মধ্যে ডিম থাকে। বিভিন্ন পোকামাকড়, যেমন– শামুক, পিঁপড়া, মাছি ইত্যাদি কৃমির ডিম খেয়ে ফেলে। এদের দেহে ডিম থেকে কৃমির লার্ভা জন্মায়। হাঁসমুরগি কৃমি আক্রান্ত শামুক, পিঁপড়া, মাছি ইত্যাদি খেয়ে ফেললে কৃমি স্লারা আক্রান্ত হয়।

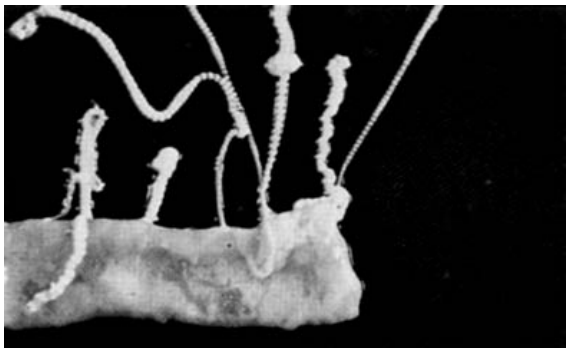

চিত্র ৩৩ ঃ পোল্ট্রির অন্ত্রনালিতে ফিতাকৃমি

কৃমির বিস্তার

বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের মাধ্যমে এদের বিস্তার ঘটে ।

লক্ষণ

ফিতাকৃমির আক্রমণে মুরগির দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়, পাতলা পায়খানা হয় ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ।

এ ধরনের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে পাখিদেহে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো–

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা ।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা ।
- পালক উসকোখুশকো হয়ে যাওয়া ।
- পাতলা পায়খানা হওয়া ।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়া ।

চিকিৎসা

নির্দিষ্ট মাত্রায় ডাইবিউটাইল-টিন-ডাইলাইউরেট (Dibutyl-tin-dilaurate) পানি অথবা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে মুরগির দেহ থেকে ফিতাকৃমি সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায় ।

প্রতিরোধ

ফিতাকৃমির প্রতিরোধে খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে ও পাখিকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ।

নিম্নলিখিতভাবে ফিতাকৃমির আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় । যথা–

- মুরগির বাসস্থানে সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বাসস্থানের আশেপাশে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলতে হবে ।
- মাঝেমধ্যে চিকিৎসার অর্ধেক মাত্রায় কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ।

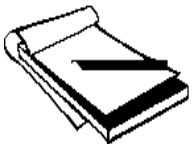

অনুশীলন (Activity) *ঃ পোল্ট্রির কয়েকটি অন্তঃপরজীবীর (দেহাভ্যন্তরের পরজীবীর) নাম ও তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাতায় লিখুন ।*

সারমর্ম ঃ যেসব পরজীবী পোষকের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ আক্রান্ত করে তাদেরকে দেহাভ্যন্তরের পরজীবী বলে । এরা পোষকের খাদ্য খেয়ে ফেলে এবং পোষকের কোষ বা কলার গঠন নষ্ট করে ফেলে । সাধারণত পোল্ট্রির মধ্যে গোলকৃমি, সুতাকৃমি এবং ফিতাকৃমির আক্রমণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় । কৃমির ডিম পোল্ট্রির মলের সাথে বের হয়ে আসে । ডিম থেকে লার্ভা হয় । খাদ্য বা পানির সাথে কৃমির লার্ভা পোল্ট্রির দেহে প্রবেশ করে এবং পরিপক্ক কৃমিতে রূপান্তরিত হয় । কৃমির আক্রমণে আক্রান্ত পোল্ট্রির ডিম ও মাংস উৎপাদন কমে যায় এবং দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে । পোল্ট্রির ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃমির আক্রমণ কমিয়ে আনা সম্ভব । মাঝেমধ্যে পোল্ট্রিকে কৃমিনাশক খাওয়ালে এসব অন্তঃপরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. সিকাল কৃমি কোন্‌টি?

i) *Ascaridia galli*
ii) *Heterakis gallinarum*
iii) *Capillaria annulata*
iv) *Capillaria obsignata*

খ. সুতাকৃমির আক্রমণের চিকিৎসায় কোন্ কৃমিনাশকটি ভালো কাজ করে?

i) লেভামিজল
ii) পাইপারজিন অ্যাডিপেট
iii) পাইপারজিন ডাই-হাইড্রোক্লোরাইড
iv) ডাইবিউটাইল-টিন-ডাইলাইউরেট

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পরজীবী আক্রমণের ফলে পাখির দেহে কোনো ক্ষতিসাধিত হয় না।

খ. কেঁচোর মাধ্যমে সুতাকৃমির বিস্তার ঘটে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ফিতাকৃমির চিকিৎসার জন্য _____ নামক কৃমিনাশক ব্যবহার করতে হয়।

খ. _____ *galli* হচ্ছে মুরগির বড় গোলকৃমি।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কৃমির ডিম ফুটে কী বের হয়?

খ. সুতাকৃমিকে ইংরেজিতে কী বলা হয়?

পাঠ ৪.২ বহিঃদেহের সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পাখির দেহের বহির্ভাগ আক্রান্তকারী পরজীবীগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবী দ্বারা আক্রান্ত পাখির দেহে প্রকাশিত রোগলক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবীর দমন ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।

বহিঃপরজীবী, যেমন– উকুন, আটালি, মাইট, ফ্লি ইত্যাদি, পোল্ট্রির দেহের বাইরের অংশ আক্রান্ত করে।

বহিঃদেহের পরজীবী (External Parasites)

যেসব পরজীবী পোল্ট্রির দেহের বাইরের অংশ আক্রান্ত করে তাদেরকে বহিঃপরজীবী বা বহিঃদেহের পরজীবী বলে। যেমন– উকুন (Lice), আটালি (Tick), মাইট (Mite) এবং ফ্লি (Flea) ইত্যাদি। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাখির চামড়া এবং পালকের মধ্যে বসবাস করে। এ ধরনের পরজীবী পাখির দেহে কামড় দেয়, রক্ত শুষে নেয় এবং অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের গরম আবহাওয়া এদের আক্রমণের অনুকূলে। যে কোনো পাখি পালন এলাকায় এদের আক্রমণ দেখা যায়। খাঁচা বা লিটার যে পদ্ধতিতেই পাখি পালন করা হোক না কেন, এদের আক্রমণ সব জায়গায়ই বিরাজমান।

উকুন পোল্ট্রির বুক, পেট ও পাখার নিচের পালক ও ত্বকের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে।

উকুন (Lice)

এরা পোল্ট্রির বুক, পেট ও পাখার নিচের পালক ও ত্বকের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে। কামড়ানি (Biting) এবং শোষক (Sucking) এ দুধরনের উকুনের মধ্যে কামড়ানি উকুন মুরগিকে আক্রান্ত করে। উকুন তাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র মুরগির মধ্যেই সম্পন্ন করে। পাখির দেহ ছাড়া এরা ছয় ঘন্টার বেশি বাঁচতে পারে না। এরা পাখির পালকের মধ্যে ডিম দেয়। দুসপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে উকুনের বাচ্চা হয় এবং পরবর্তীতে পরিপূর্ণ উকুনে পরিণত হয়।

উকুনের প্রজাতি

পোল্ট্রিকে আক্রমণকারী বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে *Menacanthus stramineus* (মেনাক্যানথাস স্ট্র্যামিনিয়াস) ও *Lipeurus caponis (লাইপেউরাস ক্যাপোনিস)* অন্যতম।

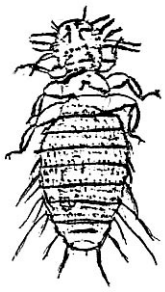

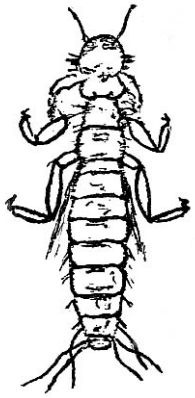

ক– *Menacanthus stramineus* খ– *Lipeurus caponis*

চিত্র ৩৪ (ক, খ) ঃ *Menacanthus stramineus* ও *Lipeurus caponis* প্রজাতির উকুন

রোগলক্ষণ

উকুনের আক্রমণে পাখি অস্থির হয়; এতে চামড়া ও পালক নষ্ট হয়; তাছাড়া ডিম উৎপাদনও কমে যায় ।

উকুনের আক্রমণে পাখির দেহে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তা নিম্নরূপ–

- যেহেতু উকুন চামড়ার উপরের অংশে কামড় দেয়, তাই মুরগি ঠোঁট দিয়ে শরীরের মধ্যে চুলকায় ।
- পাখির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায় ।
- চামড়া নষ্ট হয়ে যায় ।
- পাখি পালক খেয়ে ফেলে ।
- ডিম উৎপাদন কমে যায় ।

প্রতিরোধ ও দমন

যে এলাকায় প্রতি বছর উকুনের আক্রমণ দেখা দেয়, সে এলাকার মুরগির ঘরে মাঝেমধ্যে উকুননাশক স্প্রে করে দিতে হবে ।

নিম্নলিখিতভাবে পাখিতে উকুনের আক্রমণ প্রতিরোধ ও দমন করা যায় । যথা–

- মুরগির ঘরে যাতে বন্য পাখি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- পাখির দেহে উকুন আছে কি–না প্রতিদিন তা যাচাই করতে হবে ।
- সুস্থ পাখির ঘরে উকুন আক্রান্ত পাখি ঢুকতে দেয়া যাবে না ।
- একই ব্যক্তিকে সুস্থ ও আক্রান্ত পাখির ঘরে কাজ করতে দেয়া যাবে না ।
- যে এলাকাতে প্রতি বছর উকুনের আক্রমণ দেখা দেয়, সে এলাকার মুরগির ঘরে মাঝেমধ্যে উকুননাশক স্প্রে (Spray) করে দিতে হবে ।

চিকিৎসা

ম্যালাথিয়ন, কার্বারাইল, ফেনক্লোরফস ইত্যাদি নামক কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি বা বালিতে মিশিয়ে গোসল বা ধূল্লিান করতে দিতে হবে ।

উকুননাশক ব্যবহারের নিয়মাবলী

নিম্নলিখিতভাবে উকুননাশক ব্যবহার করতে হয় । যেমন–

- মুরগির ঘরে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করা যায় ।
- ছাই বা বালিতে কীটনাশক মিশিয়ে মুরগির ঘরের বিভিন্ন জায়গায় দেয়া যায় ।
- মাথা বাইরে রেখে আক্রান্ত মুরগিকে কীটনাশকমিশ্রিত পানিতে ডুবানো যায় ।

এছাড়াও একটোডিপ ফোর্ট (ব্রেমার ফার্মা) নামক ওষুধ ১ মিলিলিটার মাত্রায় ৪–৮ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায় ।

আটালি (Ticks)

আটালি পোল্ট্রির দেহের রক্ত শোষণের পর দেহ থেকে নিচে নেমে পড়ে ।

আটালি পোল্ট্রির দেহের রক্ত শোষণ করে । রক্ত শোষণের পর এরা পাখির দেহ থেকে নিচে নেমে পড়ে । পুরুষ আটালি যৌন সঙ্গমের পর মারা যায় । স্ত্রী আটালি পাখির ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ডিম দেয় । এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা হয় । লার্ভা থেকে নিম্ফ (Nymph) এবং নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ আটালিতে রূপান্তরিত হয় । সাধারণত আটালি দিনের বেলায় বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকে এবং রাতে খাদ্যের সন্ধানে বের হয় । তাই রাতে এরা পাখির গায়ে বসে এবং রক্ত শোষণ করে ।

আটালির নাম

পোল্ট্রির আটালির মধ্যে *Argas persicus (অ্যারগাস পারসিকাস), Argas reflexus (অ্যারগাস রিফ্লেক্সাস)* অন্যতম ।

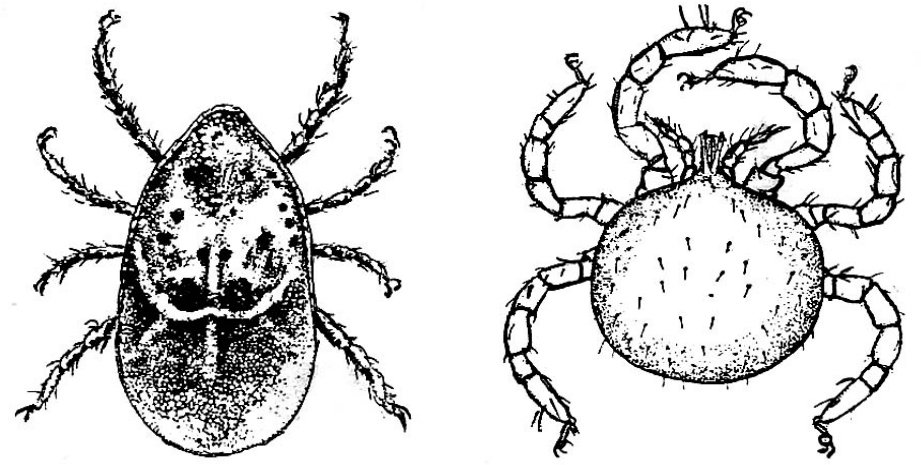

ক– পূর্ণবয়স্ক খ– লার্ভা

চিত্র ৩৫ (ক, খ) ঃ পোল্ট্রির *Argas persicus* প্রজাতির আটালি

লক্ষণ

আটালি কর্তৃক পাখির রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ।

আটালি আক্রমণের ফলে পাখির দেহে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলো–

- আটালি কর্তৃক পাখির রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে পাখির দেহে রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়া ।
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটা এবং ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া ।
- বাতিল পাখির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ।
- পাখির মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পাওয়া ।

চিকিৎসা

ম্যালাথিয়ন ও কার্বারাইল আটালি ধ্বংসের জন্য কার্যকর কীটনাশক ।

ম্যালাথিয়ন এবং কার্বারাইল আটালি ধ্বংসের জন্য কার্যকর কীটনাশক । পাখির ঘর ও ঘরের যন্ত্রপাতির মধ্যে এসব কীটনাশক স্প্রে করে দিতে হয় । ১৪ দিন পর একইভাবে আবার কীটনাশক স্প্রে করতে হয় ।

প্রতিরোধ ও দমন

পাখির আটালি প্রতিরোধ ও দমনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যায় । যথা–

- পাখির ঘর, ঘরের আশপাশ এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে শোধিত করতে হবে ।
- আটালি আক্রান্ত এলাকায় মাঝেমধ্যে কীটনাশক স্প্রে করে দিতে হবে ।

মাইট (Mite)

মাইট পাখির মাথা ও ঘাড়ের পালকের গোড়ার ত্বক, পালক, পা ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে বাস করে ।

মাইট সাধারণত পোল্ট্রির মাথা ও ঘাড়ের পালকের গোড়ার ত্বকে, পালকের মধ্যে, পা ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে বসবাস করে ।

জীবনচক্র (Life Cycle)

মাইট পোল্ট্রির ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ডিম পাড়ে । ২–৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা হয় । লার্ভা থেকে নিম্ফ এবং নিম্ফ থেকে পূর্ণবয়স্ক মাইটে রূপান্তরিত হয় ।

মাইটের প্রজাতি

বিভিন্ন প্রজাতির মাইট পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে। যেমন–

i) *Dermanyssus gallinae (ডারমানিসাস গ্যালিনি)*– একে রেড মাইট অভ্ পোল্ট্রি (Red Mite of Poultry) বলা হয়।

ii) *Ornithonyssus sylvarum (অরনিথোনিসাস সিলভেরাম)*– একে নরদার্ন ফাউল মাইট (Northern Fowl Mite) বলে।

(iii) *Cnemidocoptes mutans (নেমিডোকপটিস মিউটেনস)*– একে স্কেলি লেগ অভ্ পোল্ট্রি (Scaly Leg of Poultry) বলা হয়।

(iv) *Cnemidocoptes gallinae (নেমিডোকপটিস গ্যালিনি)*– একে ডিপ্লুমিং মাইট অভ্ পোল্ট্রি (Depluming Mite of Poultry) বলা হয়।

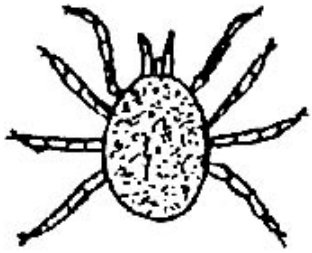

ক– *Dermanyssus gallinae*

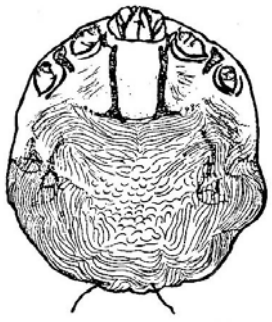

খ– *Cnemidocoptes mutans*

চিত্র ৩৬ (ক, খ) ঃ *Dermanyssus gallinae* ও *Cnemidocoptes mutans* প্রজাতির মাইট

লক্ষণ

মাইট আক্রান্ত পাখির ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়, পা স্কেলি হয়ে যায়, ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।

মাইট আক্রান্ত পোল্ট্রিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- মাইট আক্রান্ত স্থানে কামড় দিয়ে রক্ত চুষে নেয় বলে পাখির মধ্যে অত্যধিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
- পাখি ঠোঁট দিয়ে আক্রান্ত স্থানের পালক তুলে ফেলে।
- আক্রান্ত পাখির ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- আক্রান্ত পায়ের স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হয়ে পুরু হয়ে যায় ও রুক্ষ রূপ ধারণ করে।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

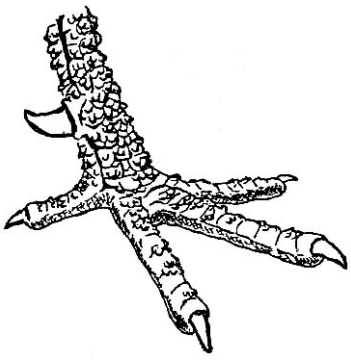

চিত্র ৩৭ ঃ স্কেলি লেগ মাইটে আক্রান্ত মুরগির পা

চিকিৎসা

ম্যালাথিয়ন অথবা কার্বারাইল নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া স্কেলি লেগ মুরগির পা কেরোসিন তেলে চুবিয়ে চিকিৎসা করা যায়।

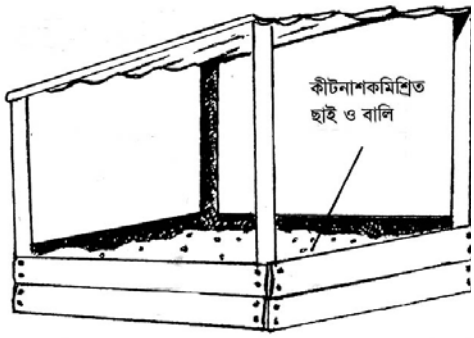

ক– ধুলি স্নান করার জায়গা

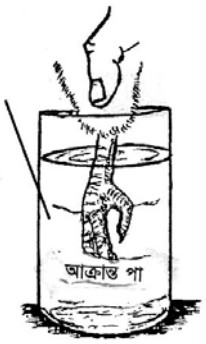

খ– কেরোসিনে পা চুবানো

চিত্র ৩৮ (ক, খ) ঃ মাইট আক্রান্ত পোল্ট্রির চিকিৎসা

ফ্লি (Flea)

ফ্লি পাখির মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল ও চোখের চারদিকে লেগে থাকে।

ফ্লি পোল্ট্রির মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল এবং চোখের চারদিকে লেগে থাকে। স্ত্রী ফ্লি পোষকের দেহে ডিম দেয়। ডিম থেকে লার্ভা হয়। লার্ভা পোষকের দেহ থেকে মাটিতে নেমে পড়ে। এরপর চার সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফ্লিতে রূপান্তরিত হয়।

ফ্লি'র প্রজাতি

পোল্ট্রির ফ্লি'র মধ্যে *Echidnophaga gallinacea (একিডনোফেগা গ্যালিনেসিয়া)* নামক প্রজাতি গুরুত্বপুর্ণ।

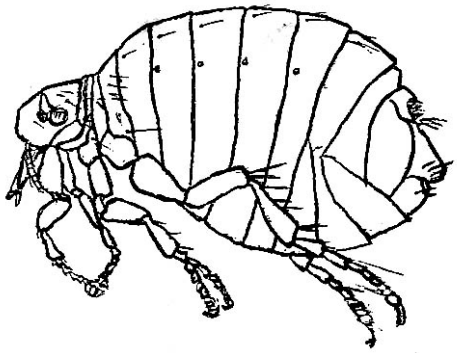

ক– পূর্ণবয়স্ক ফ্লি

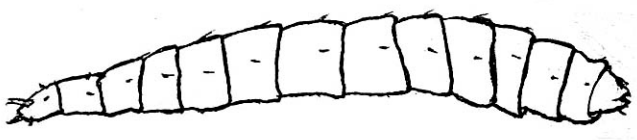

খ–লার্ভা

চিত্র ৩৯ (ক, খ) ঃ পোল্ট্রির *Echidnophaga gallinacea* প্রজাতির ফ্লি

লক্ষণ

ফ্লি আক্রমণের ফলে পাখির দেহে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা দেয়। যথা–

- এরা পাখির দেহের রক্ত চুষে নেয় বলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- অত্যধিক চুলকানির কারণে পাখি ঠোঁট দিয়ে পালক তুলে ফেলে।
- অত্যধিক আক্রমণে পাখির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং ডিমপাড়া কমে যায়।

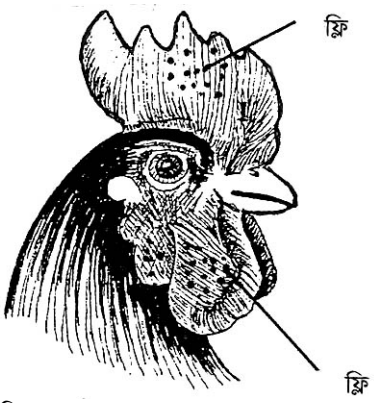

চিত্র ৪০ ঃ ফ্লি আক্রান্ত মোরগের মাথা ও গলার ফুল

ম্যালাথিয়ন ফ্লি ধ্বংসের জন্য খুবই কার্যকর কীটনাশক।

চিকিৎসা

ম্যালাথিয়ন ফ্লি ধ্বংসের জন্য খুবই কার্যকরী কীটনাশক। প্রথম চিকিৎসার ৭ দিন পর পুনরায় চিকিৎসা করতে হয়। মুরগির ঘর এবং এর আশেপাশেও ম্যালাথিয়ন স্প্রে করে দিতে হয়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ কয়েকটি বহিঃপরজীবীর বৈজ্ঞানিক নাম এবং এদের দ্বারা আক্রান্ত মুরগির চিকিৎসা পদ্ধতি খাতায় লিখুন।*

সারমর্ম ঃ আমাদের দেশে পোল্ট্রিতে বহিঃপরজীবীর বেশ আক্রমণ হয়। পোল্ট্রির বহিঃপরজীবীর মধ্যে উকুন, আটালি, মাইট, ফ্লি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরা পোল্ট্রির চামড়া ও পালকের মধ্যে বাস করে। এরা একদিকে পোষকের রক্ত চুষে নেয়, অন্যদিকে পোল্ট্রির উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। এরা পোষক ছাড়া বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে (উকুন বাদে)। এদের আক্রমণ রোধ করার লক্ষ্যে পোল্ট্রির ঘরের আশেপাশে শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. উকুন কয় ধরনের?

i) দুই
ii) চার
iii) পাঁচ
iv) তিন

খ. বহিঃপরজীবীর ডিম ফুটে কী হয়?

i) সরাসরি পূর্ণাঙ্গ পরজীবী হয়
ii) লার্ভা হয়
iii) নিম্ফ হয়
iv) পিউপা হয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পরজীবী পোষকের রক্ত চুষে খেলে পোষকের দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

খ. ম্যালাথিয়ন অন্তঃপরজীবী ধ্বংসের ওষুধ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. *Lipeurus caponis* হচ্ছে _____ এর বৈজ্ঞানিক নাম।

খ. যৌন সঙ্গমের পর _____ আটালি মারা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. রেড মাইট অভ্ পোল্ট্রির বৈজ্ঞানিক নাম কী?

খ. ফ্লি ধ্বংসের কার্যকর ওষুধের নাম কী?

পাঠ ৪.৩ প্রোটোজোয়াজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির দেহ আক্রান্তকারী প্রোটোজোয়ার নাম বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রিতে প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগগুলোর নাম, লক্ষণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, চিকিৎসা, প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রোটোজোয়া অন্য জীবের দেহে বাস করে ও বিভিন্ন গবাদিপশু ও পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে।

প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ

প্রোটোজোয়া (Protozoa) হচ্ছে এককোষি জীব, যা অন্য জীবের দেহে বসবাস করে জীবনধারণ করে। মানুষসহ বিভিন্ন গবাদিপশু ও পোল্ট্রিকে এরা আক্রান্ত করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া পোল্ট্রির দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এখানে প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট পোল্ট্রির কয়েকটি রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আইমেরিয়া গণভুক্ত কয়েক প্রজাতির ককসিডিয়া দ্বারা পোল্ট্রির ককসিডিওসিস রোগ —

মুরগির ককসিডিওসিস (Coccidiosis in Chicken)

ককসিডিওসিস আইমেরিয়া গণভুক্ত কয়েকটি প্রজাতির ককসিডিয়া দ্বারা সৃষ্ট পোল্ট্রির মারাত্মক সংক্রামক প্রোটোজোয়ান রোগ। প্রধানত বাচ্চা ও বাড়ন্ত বয়সের পাখি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগের প্রোটোজোয়ার বিভিন্ন প্রজাতি পোল্ট্রির অন্ত্রনালির বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত করে।

মুরগির ককসিডিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে *Eimeria tenella* সবচেয়ে মারাত্মক।

রোগের কারণ

প্রধানত নিম্নের কয়েকটি প্রজাতির ককসিডিয়া দ্বারা মুরগির ককসিডিওসিস রোগ হয়। যথা–

(i) *Eimeria tenella (আইমেরিয়া টেনেল্লা)*– এটি মুরগির জন্য মারাত্মক প্রকৃতির ককসিডিওসিস রোগের কারণ। এ প্রোটোজোয়াটি মুরগির অন্ত্রনালির সিকাম অংশকে আক্রান্ত করে বলে একে "সিকাল ককসিডিওসিস" বলে।

(ii) *Eimeria necatrix (আইমেরিয়া নিকাট্রিক্স)*– এ প্রোটোজোয়া মুরগির ক্ষুদ্রান্ত্রের (Small Intestine) উপরের অংশকে বেশি আক্রান্ত করে।

(iii) *Eimeria acervulina (আইমেরিয়া অ্যাসারভিউলিনা)*– এটি মুরগির খাদ্যনালির উপরের অংশে পাওয়া যায়।

(iv) *Eimeria maxima (আইমেরিয়া ম্যাক্সিমা)*– এটি মুরগির ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের অংশকে আক্রমণ করে।

(v) *Eimeria brunetti (আইমেরিয়া ব্রুনেটি)*– এটি মুরগির খাদ্যনালির নিচের অংশ, সিকাম এবং মলাশয়কে (Rectum) আক্রান্ত করে।

আইমেরিয়ার জীবনচক্র

আইমেরিয়ার জীবনচক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ–

আক্রান্ত পোল্ট্রির পায়খানার সাথে *Eimeria* এর উসিস্ট (Oocyst) বের হয়ে আসে

⇓

স্পোরুলেটেড উসিস্ট (Sporulated Oocyst)

⇓

খাদ্য অথবা পানির সাথে পোল্ট্রির দেহে প্রবেশ করে

⇓

পোল্ট্রির অন্ত্রনালির মধ্যে স্পোরুলেটেড উসিস্ট থেকে স্পোরোজয়েট বের হয়ে আসে

⇓

ট্রোপোজয়েট (কোষের ভিতরে)
⇓
সিজোন্টে (Schizonts) রূপান্তরিত হয়
⇓
অন্ত্রের নিউক্লিয়াসে মেরোজয়েটে (Merozoite) রূপান্তরিত হয়
⇓
স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেট সৃষ্টি হয়
⇓
জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি হয়
⇓
উসিস্ট উৎপন্ন হয়

রোগ সংক্রমণ পদ্ধতি

আক্রান্ত পোল্ট্রির পায়খানার সাথে আইমেরিয়ার উসিস্ট বের হয়ে আসে এবং খাদ্য, পানি, লিটার ও পরিবেশকে কলুষিত করে। এ উসিস্ট বিভিন্নভাবে একস্থান হতে অন্যস্থানে সংক্রমিত হয়। যথা–

- মানুষের ব্যবহৃত জুতো, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ও লিটারের মাধ্যমে।
- খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- তেলাপোকা, ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে।

লক্ষণ

ককসিডিওসিস রোগে মুরগি রক্ত ও আমমিশ্রিত পায়খানা করে।

আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- হঠাৎ খাদ্য ও পানি গ্রহণ থেকে বিরত হওয়া।
- ঝাঁক থেকে আলাদা হয়ে বসে থাকা।
- পাতলা পায়খানা করা।
- রক্ত এবং আমমিশ্রিত পায়খানা করা।
- পালক নিচের দিকে ঝুলে পড়া।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিমের সংখ্যা কমে যাওয়া।

চিত্র ৪১ ঃ ককসিডিওসিস রোগে আক্রান্ত মুরগির বাচ্চা

রোগ নির্ণয়

অল্প বয়স্ক পাখি আক্রান্তের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, মলে উসিস্ট শণাক্তকরণ, ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে পাখির ককসিডিওসিস রোগ নির্ণয় করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে পোল্ট্রিতে ককসিডিওসিস রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- অল্প বয়স্ক পাখি আক্রান্তের ইতিহাসসহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, যেমন– রক্তমিশ্রিত মল দেখে।
- আক্রান্ত পাখির মল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে উসিস্ট শণাক্তকরণের মাধ্যমে।
- এ রোগে মৃত পাখির ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। বিভিন্ন প্রজাতির *Eimeria* পাখির অন্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষত সৃষ্টি করে। এগুলো দেখে সহজেই *Eimeria* এর প্রজাতি শণাক্ত করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ–
  - সিকামে রক্তক্ষরণের ক্ষত *Eimeria tenella* প্রজাতির সংক্রমণ নির্দেশ করে।
  - ক্ষুদান্ত্রে ধূসর বা সাদাটে দাগ *Eimeria acervulina* প্রজাতির তীব্র প্রকৃতির সংক্রমণ নির্দেশ করে।
  - ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যাংশে রক্তক্ষরণের ক্ষত *Eimeria necatrix* প্রজাতির সংক্রমণ নির্দেশ করে।
  - ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষাংশে ধূসর, বাদামি বা গোলাপি মিউকাসযুক্ত ক্ষত *Eimeria maxima* প্রজাতির উপস্থিতি নির্দেশ করে।
  - ক্ষুদান্ত্রের নিচের অংশ ও মলাশয়ে ক্ষত এবং পনিরের মতো সাদা পদার্থের উপস্থিতি *Eimeria brunetti* প্রজাতির উপস্থিতি নির্দেশ করে।

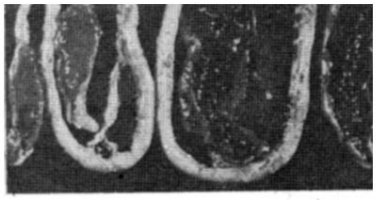

ক– *Eimeria tenella* দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত

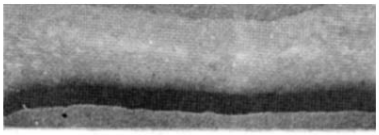

খ– *Eimeria acervulina* দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত

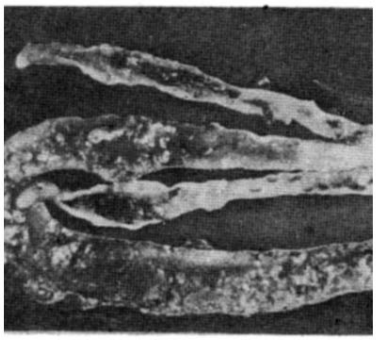

গ– *Eimeria brunetti* দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত

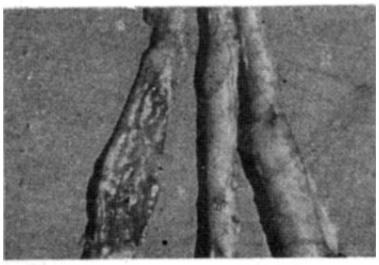

ঘ– *Eimeria necatrix* দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত

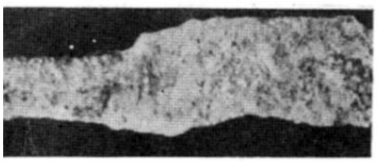

ঙ– *Eimeria maxima* দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত

চিত্র ৪২ (ক–ঙ) ঃ মুরগির অন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির *উরসবৎরধ স্পা*রা সৃষ্ট ক্ষত

চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ওষুধের যে কোনো একটি ওষুধ দিয়ে আক্রান্ত মুরগির চিকিৎসা করানো যায়। যথা–

- ই.এস.বি$_৩$. (নোভারটিস)– ১.০–১.৫ গ্রাম ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।
  অথবা
- এমবাজিন পাউডার (রোন-পোলেন্ক)– ১.৫–২.০ গ্রাম ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।
  অথবা
- সুপারকক (ব্রেমার ফার্মা)– ১.৫ গ্রাম ওষুধ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।
  অথবা
- ককসিস্টপ (ইন্টারভেট)– ১ গ্রাম ওষুধ ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যের সাথে ২–১৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পাখিকে ককসিডিওস্ট্যাট (Coccidiostat) খাওয়ালে ককসিডিওসিস রোগ হয় না। ককসিডিওস্ট্যাট হিসেবে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি খাওয়ানো যেতে পারে। যথা–

খাদ্যের সাথে ২–১৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পাখিকে ককসিডিওস্ট্যাট খাওয়ালে ককসিডিওসিস রোগ হয় না।

- ডট ২৫%– প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ০.৫ গ্রাম মাত্রায় মিশিয়ে খাওয়াতে হয়।
- ক্লোপিডল ১০০%– প্রতি ৮ কেজি খাদ্যের সাথে ১ গ্রাম মাত্রায় মিশিয়ে খাওয়াতে হয়।
- অ্যাম্প্রোলিয়াম অথবা মোনেনসিন সোডিয়ামও নির্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়ানো যেতে পারে।

এগুলো ব্যবহারের সাথে সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। যথা–

মুরগির ঘরের আশেপাশে শক্তিশালী জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে।

- মুরগির ঘরের লিটার সবসময় শুষ্ক রাখতে হবে।
- বাচ্চা এবং বয়স্ক মুরগি একসঙ্গে পালন করা যাবে না। কারণ, বয়স্ক মুরগি বাচ্চা মুরগির জন্য রোগের জীবাণু বহন করে।
- মুরগির ঘরের আশেপাশে সবসময় শক্তিশালী জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। যেমন– আয়োসান ২%, সুপারসেপ্ট ২–৩%, এনটেক ২% হ্যালামিড ইত্যাদি।

অনুশীলন (Activity) *ঃ মুরগিকে আক্রান্তকারী কয়েকটি ককসিডিয়া প্রজাতির নাম খাতায় লিখুন।*

হিস্টোমোনিয়াসিস (Histomoniasis) রোগ

হিস্টোমোনিয়াসিস একটি প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ। এতে পাখির মাথা কালো হয়ে যায়।

এটি *Histomonas meleagridis (হিস্টোমোনাস মেলিয়াগ্রিডিস)* নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ। এ রোগের প্রোটোজোয়া পাখির বৃহদান্ত্র এবং যকৃতকে আক্রান্ত করে। এ রোগে পাখির মাথা কালো হয় বলে একে ব্ল্যাক হেড ডিজিজ (Black Head Disease) বলা হয়। এ রোগে প্রধানত টার্কি পাখি আক্রান্ত হয়। তবে, মুরগিও আক্রান্ত হতে পারে।

রোগ সংক্রমণ

নিম্নলিখিতভাবে মুরগির দেহে এ রোগের প্রোটোজোয়ার সংক্রমণ ঘটে। যেমন–

- পাখির অন্ত্রের কৃমিদেহে এ রোগের প্রোটোজোয়া ঢুকে পড়ে। পাখি যখন পায়খানা করে তখন কৃমির ডিমের সঙ্গে এরাও বের হয়ে আসে। এরপর খাদ্য অথবা পানির সাথে মিশে পাখির দেহে প্রবেশ করে।
- কেঁচো, মাছি প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগের প্রোটোজোয়া একস্থান হতে অন্যস্থানে সংক্রমিত হয়।

রোগ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এ রোগ সৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। যথা–

- অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
- খাদ্য কম দিলে বা পাখি লিটার খেলে।
- মাধ্যমিক পোষক, যথা– কেঁচো এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ।
- অন্ত্রের পি.এইচ. (P^H) অ্যালক্যালাইন হলে।

লক্ষণ

আক্রান্ত মুরগি হলুদ রঙের পাতলা পায়খানা করে। কোনো কোনো পাখির মাথার চামড়া কালো হয়ে যায়।

আক্রান্ত মুরগিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যাবে। যেমন–

- পালক নিচের দিকে ঝুলে পড়া।
- পালক ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়ে যাওয়া।
- হলুদ রঙের পাতলা পায়খানা হওয়া।
- মাথা নিচের দিকে করে রাখা।
- কোনো কোনো পাখির ক্ষেত্রে মাথার চামড়া কালো হয়ে যাওয়া।

চিত্র ৪৩ ঃ হিস্টোমোনিয়াসিস রোগে আক্রান্ত টার্কি পাখি

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ থেকে।
- ময়নাতদন্তে প্রাপ্ত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন থেকে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যায়। যথা–
  - পাখির আক্রান্ত সিকামে ক্যাসিয়াস কাস্ট (Caseous Cast) থাকে।
  - যকৃতে এক সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট অনেকগুলো গোলাকৃতির পচনশীল ক্ষত থাকে।

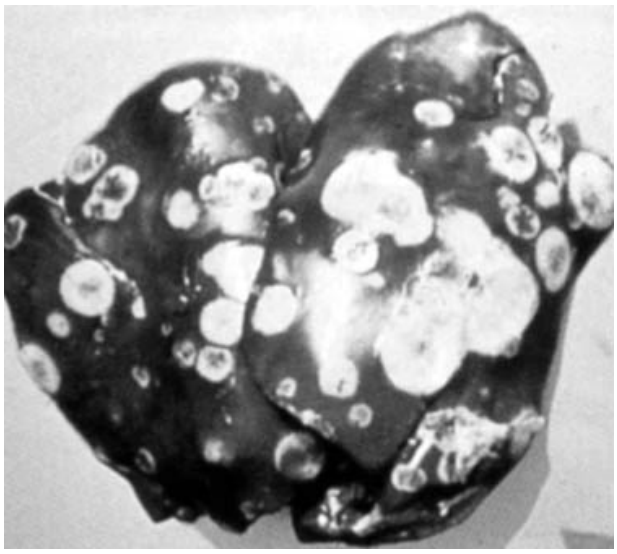

চিত্র ৪৪ ঃ হিস্টোমোনিয়াসিস রোগে আক্রান্ত টার্কি পাখির যকৃতের ক্ষত

চিকিৎসা

হিস্টোমোনিয়াসিস রোগের চিকিৎসায় ডাইমেট্রাইডাজল ও নিথিয়াজিড ভালো ফল দেয়।

নিম্নলিখিত ওষুধগুলো ব্যবহার করে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। যথা–

- ডাইমেট্রাইডাজল (Dimetridazole)– ০.০৬% মাত্রায় খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ৭ দিন খাওয়াতে হবে।
- নিথিয়াজিড (Nithiajid)– ০.০২% মাত্রায় খাদ্য অথবা পানির সাথে মিশিয়ে ৭ দিন খাওয়াতে হয়।

প্রতিরোধ

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- পাখির বাসস্থান স্বাস্থ্যসম্মত রাখা।
- নিয়মিত কৃমিনাশক খাইয়ে সিকাল কৃমি দমন করা।
- বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের পাখি একসাথে পালন না করা।
- বিভিন্ন বয়সের পাখি একসাথে পালন না করা।

অনুশীলন (Activity) *ঃ পোল্ট্রির হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশগুলো খাতায় লিখুন।*

সারমর্ম ঃ প্রোটোজোয়া এককোষি প্রাণী। এরা অন্য জীবের দেহে বসবাস করে। *Eimeria* গণভুক্ত কয়েকটি প্রজাতির ককসিডিয়া দ্বারা পোল্ট্রির ককসিডিওসিস রোগ সৃষ্টি হয়। ককসিডিওসিস রোগের প্রোটোজোয়াগুলোর মধ্যে *Eimeria tenella* মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের আক্রমণের ফলে মুরগিতে রক্ত পায়খানা হয়। হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ মুরগির ব্ল্যাক হেড ডিজিজ নামে পরিচিত। কেঁচো, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের মাধ্যমে একস্থান হতে অন্যস্থানে এ রোগের প্রোটোজোয়ার সংক্রমণ ঘটে। মুরগির ঘর স্বাস্থ্যসম্মত হলে পাখিতে প্রোটোজোয়াঘটিত রেগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যের সাথে প্রতিরোধক মাত্রায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

পাঠোত্তরে মূল্যায়ন ৪.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. প্রোটোজোয়া কী ধরনের জীব?

i) এককোষি
ii) বহুকোষি
iii) আদিকোষি
iv) প্রকৃতকোষি

খ. পাখির হিস্টোমোনিয়াসিস রোগের চিকিৎসায় কী ব্যবহার করা হয়?

i) ই.এস. $বি_৩$
ii) নিথিয়াজিড
iii) ক্লোপিডল
iv) এমবাজিন

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ককসিডিওসিস রোগের প্রধান লক্ষণ হলো রক্ত পায়খানা।

খ. অন্ত্রের পি.এইচ. অ্যালাকালাইন হলে হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ককসিডিওসিস রোগ চিকিৎসার জন্য _____ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

খ. হিস্টোমোনিয়াসিসকে _____ ডিজিজও বলা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. *Eimeria tenella* দ্বারা সৃষ্ট রোগকে কী বলে?

খ. স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেট মিলে কী হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৪ পরীক্ষাগারে মল পরীক্ষা করে কৃমির ডিম শণাক্ত করা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পাখির কৃমির ডিম শণাক্ত করার জন্য নমুনা হিসেবে মল পরীক্ষা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে কৃমির ডিম শণাক্ত করতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

আক্রান্ত পাখির মল থেকে কৃমির ডিম শণাক্ত করার জন্য প্রথমে মলের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে ও পরে তা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করতে হবে।

দু'ভাবে মুরগির মলের নমুনা সংগ্রহ করা যায়। যথা– তলপেটে চাপ দিয়ে ও মলের উপরের অংশ থেকে নিয়ে।

নমুনা সংগ্রহ

দু'ভাবে মুরগির মল সংগ্রহ করা যায়। যথা–

১. মুরগির তলপেটে আস্তে আস্তে চাপ দিলে মলদ্বার দিয়ে মল বের হয়। এ সময় একটি টেস্ট টিউব মলদ্বারের নিচে ধরলে মল টেস্ট টিউবে পড়বে।

২. সদ্য ত্যাগকৃত মলের উপরের অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা উচিত।

সরাসরি স্মিয়ার ও ফ্লোটেওশন পদ্ধতিতে মলের নমুনা থেকে কৃমির ডিম শণাক্ত যায়।

মল পরীক্ষা (অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা)

দু'টো পদ্ধতিতে মুরগির মল পরীক্ষা করে কৃমির ডিম শণাক্ত করা যায়।

১. সরাসরি স্মিয়ার পদ্ধতি (Direct Smear Method)

২. ফ্লোটেশন পদ্ধতি (Floatation Method)

ডাইরেক্ট স্মিয়ায় পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কাঁচের পাইড– ১টি

২. কভার পিপ– একাধিক

৩. ছোট কাঠি– ১টি

৪. অণুবীক্ষণ যন্ত্র– ১টি

৫. ব্যাবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে কাঁচের পাইড ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।
- এবার ছোট কাঠির সাহায্যে টেস্ট টিউব থেকে একটু মল কাঁচের পাইডের উপর নিন।
- সামান্য একটু পানির ফোটা মলের সাথে মিশিয়ে নিন।
- কাঠির সাহায্যে পাইডের উপর মল ভালোভাবে স্মিয়ার করে নিন এবং মলের সাথে লেগে থাকা আবর্জনা সরিয়ে ফেলুন।
- এবার কভার পিপ দিয়ে মলের স্মিয়ার ঢেকে দিন।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাইডটি পর্যবেক্ষণ করুন।
- কৃমির ডিম শণাক্ত করে খাতায় লিখুন।
- এভাবে কমপক্ষে দুটো পাইড তৈরি করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কৃমির ডিম শণাক্ত করে নিশ্চিত হোন।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন।

সুবিধা
কম সময়ে সহজ উপায়ে কৃমির ডিম শণাক্ত করা যায় ।

অসুবিধা
অনেক সময় মলের আবর্জনার কারণে কৃমির ডিম শণাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

ফ্লোটেশন পদ্ধতি (Floatation method)

প্রয়োজনীয় উপকরণ
১. টেস্ট টিউব– ১টি
২. রাসায়নিক দ্রব্য–
   ক. জিঙ্ক সালফেট (৩৩%) অথবা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (৪১%)
৩. সেন্ট্রিফিউজ মেশিন– ১টি
৪. কাচের বিকার– ১টি
৫. ছাঁকুনি– ১টি
৬. কাঁচের ফ্লাইড– ১টি
৭. কভার পিপ– একাধিক
৮. অণুবীক্ষণ যন্ত্র– ১টি
৯. ব্যাবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি ।

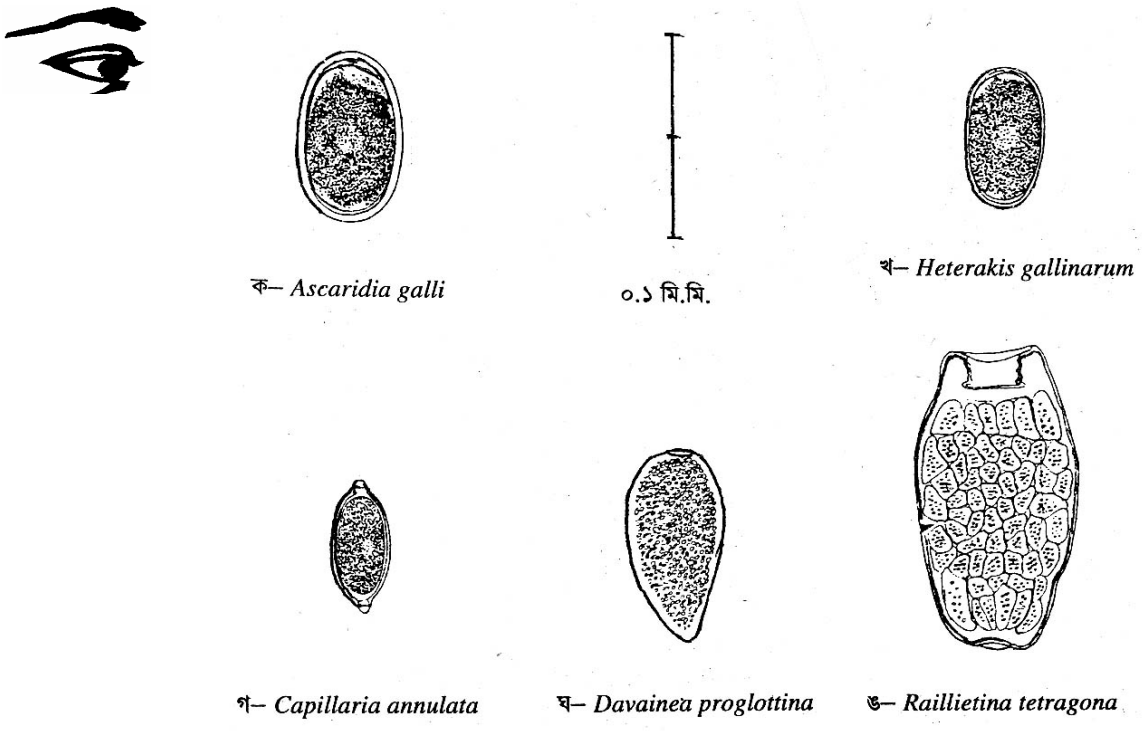

চিত্র ৪৫ (ক–ঙ) ঃ পোল্ট্রিকে আক্রমণকারী বিভিন্ন প্রজাতির কৃমির ডিম

কাজের ধারা

- কাঁচের বিকারে কিছু পরিমাণ মল নিন।
- ১০০ মিলিলিটার জিঙ্ক সালফেট অথবা ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দ্রবণ বিকারের মধ্যে ঢালুন এবং ভালোভাবে মলের সাথে মিশিয়ে নিন।
- এবার ছাকুনি দিয়ে দ্রবণ থেকে একটি টেস্ট টিউব কানায় কানায় ভরিয়ে নিন।
- সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের সাহায্যে টেস্ট টিউবটি ২–৩ মিনিট (১৫০০ রোটেশন/মিনিট) সেন্ট্রিফিউজ করে নিন।
- এবার কভার পিপ দিয়ে টেস্ট টিউবটি ঢেকে দিন। দেখা যাবে যে, কভার পিপ টেস্ট টিউবের দ্রবণের উপরের অংশ স্পর্শ করবে।
- তারপর কভার পিপ তুলে কাঁচের পাইডে রেখে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যাহায্যে পর্যবেক্ষণ করুন।
- কৃমির ডিম ভালোভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখে নিশ্চিত হোন।
- এভাবে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার অণুশীলন করুন।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন।

সুবিধা

এ পদ্ধতিতে কৃমির ডিম নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করা যায়। কারণ, এতে সহজেই কৃমির ডিম মলের আবর্জনা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

পাঠ ৪.৫ পরীক্ষাগারে মল পরীক্ষা করে ককসিডিয়ার উসিস্ট শণাক্ত করা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মুরগির মল সংগ্রহ করতে পারবেন।
- মুরগির মলের নমুনা থেকে রক্ত আমাশয়ের উসিস্ট শণাক্ত করতে পারবেন।

ককসিডিয়ার উসিস্ট শণাক্ত করার জন্য ফ্লোটেশন পদ্ধতি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

আক্রান্ত মুরগির মলের নমুনা থেকে ককসিডিয়ার উসিস্ট শণাক্ত করতে হলে প্রথমে মলের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর সংগৃহীত নমুনা দিয়ে পাঠ ৪.৪ এ বর্ণিত ফ্লোটেশন পদ্ধতির ন্যায় পরীক্ষার মাধ্যমে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ককসিডিয়ার উসিস্ট শণাক্ত করা যায়।

নমুনা সংগ্রহ

মুরগির তলপেটে চাপ দিয়ে পায়খানা বের করে অথবা সদ্য ত্যাগকৃত মলের উপরের অংশ থেকে কিছু মল সংগ্রহ করতে হবে।

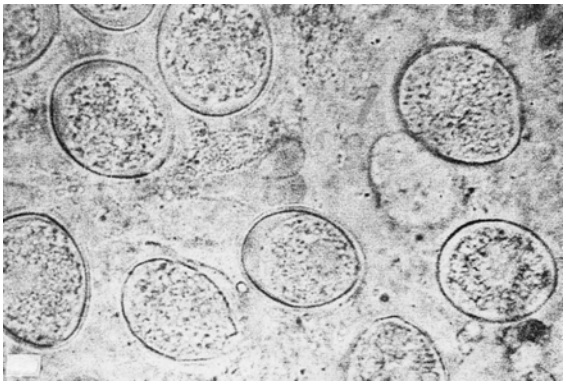

চিত্র ৪৬ ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ককসিডিয়ার উসিস্ট

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কাঁচের বিকার– ১টি
২. কভার পিপ– একাধিক
৩. টেস্ট টিউব– ১টি
৪. কাঠি– ১টি
৫. কাচের পাইড– একাধিক
৬. জিংক সালফেট দ্রবণ– প্রয়োজনমতো
৭. ছাঁকুনি– ১টি
৮. সেন্ট্রিফিডিজ মেশিন– ১টি
৯. অণুবীক্ষণ যন্ত্র– ১টি
১০. ব্যাবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে পরিষ্কার কাঁচের বিকারে ১০০ মিলিলিটার জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ নিন।
- সংগ্রহকৃত নমুনা হতে কিছু পরিমাণ মল জিঙ্ক সালফেট দ্রবণের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
- এবার ছাঁকুনি দিয়ে ছেকে টেস্ট টিউব কানায় কানায় ভর্তি করুন।
- সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের সাহায্যে টেস্ট টিউবটি ২–৩ মিনিট (১৫০০ আর.পি.এম.) সেন্ট্রিফিউজ করে নিন।
- কভার পিপ দিয়ে টেস্ট টিউবটি ঢাকুন। দেখা যাবে যে, কভার পিপ টেস্ট টিউবের দ্রবণ স্পর্শ করবে।
- এরপর কভার পিপটি নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখুন এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ককসিডিয়ার (রক্ত আমাশয়ের) উসিস্ট চিহ্নিত করুন।
- এভাবে পরীক্ষণটি কয়েকবার অনুশীলন করুন।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও প্রয়োজনীয় ছবি আঁকুন।
- ব্যবহারিক খাতাটি আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরজীবী কী ও কত প্রকার? এরা কীভাবে পোল্ট্রি শিল্পের ক্ষতি করে?
২। মুরগির বড় গোলকৃমি, ছোট গোলকৃমি ও সুতাকৃমির বৈজ্ঞানিক ও ইংরেজি নাম লিখুন।
৩। দেহাভ্যন্তরের পরজীবী আক্রান্ত মুরগিতে কী কী সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়?
৪। বহিঃদেহের পরজীবী বলতে কী বোঝেন? কয়েকটির নাম লিখুন।
৫। উকুনের আক্রমণে পাখির কী কী ক্ষতি হয়?
৬। চারটি মাইটের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। এদেরকে কী কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?
৮। প্রোটোজোয়া কী? মুরগির ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোজোয়ায় নাম লিখুন।
৯। ককসিডিয়ায় জীবনচক্র সংক্ষেপে লিখুন।
১০। ব্ল্যাক হেড ডিজিজ কী? এর লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। ক. ii ১। খ. i ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. ডাইবিউটাইল-টিন-ডাইলাইউরেট
৩। খ. *Ascaridia* ৪। ক. লার্ভা ৪। খ. Threadworm ev Hairworm

পাঠ ৪.২

১। ক. i ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. উকুনের ৩। খ. পুরুষ
৪। ক. *Dermanyssus gallinae* ৪। খ. ম্যালাথিয়ন

পাঠ ৪.৩

১। ক. i ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. ই.এস.বি$_৩$ ৩। খ. ব্ল্যাক হেড
৪। ক. সিকাল ককসিডিওসিস ৪। খ. জাইগোট

ইউনিট ৫
পোল্ট্রির অপুষ্টিজনিত ও অন্যান্য রোগ

ইউনিট ৫ পোল্ট্রির অপুষ্টিজনিত ও অন্যান্য রোগ

পোল্ট্রি পালনের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো পোল্ট্রিকে সুষম খাদ্য প্রদান করা। পোল্ট্রির মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং দৈহিক বৃদ্ধিসাধনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। সুষম খাদ্য হচ্ছে ছয়টি খাদ্য উপাদান, যেমন– আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, খণিজপদার্থ ও পানি আনুপাতিক হারে ও পরিমিতভাবে মিশিয়ে তৈরি খাদ্য। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপকরণ, যথা– গম, ভুট্টা, গমের ভুশি, চালের কুড়া, তিলের খৈল, লবণ, শুটকি মাছের গুড়ো, ঝিনুকের গুড়ো, কনসেনট্রেট ও ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পরিমিত পরিমাণে একসাথে মিশ্রিত করে পোল্ট্রির সুষম খাদ্য তৈরি করা হয়। এসব খাদ্য উপকরণে ছয়টি খাদ্য উপাদানের সবকটিই থাকে। খাদ্যের মধ্যে যে কোনো খাদ্য উপকরণের অভাব হলে বা খাদ্যে এগুলো অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে বা অসাঞ্জস্যপূর্ণ হলে পোল্ট্রির দেহে পুষ্টির অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয় যাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলা হয়। এ অপুষ্টিজনিত রোগের কারণে পোল্ট্রির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, ডিম ও মাংস উৎপাদন কমে যায়, এমনকী পাখির মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাছাড়া দেহে পুষ্টির অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দিলে এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষ খাদ্য বা পানির মাধ্যমে পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে। ছত্রাকের বিষ থেকে সৃষ্ট মাইকোটক্সিকোসিস পাখির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। বিভিন্ন কারণে পোল্ট্রিতে ক্যানিবালিজম রোগ দেখা দিতে পারে। ক্যানিবালিজম পোল্ট্রি উৎপাদনে অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলে। মুরগিতে অনেক সময় ডিম আটকে যাওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে। সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এতে পোল্ট্রির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ভিটামিন ও খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ, ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষজনিত রোগ, মুরগির ক্যানিবালিজম, ডিম আটকে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভিটামিনের অভাবে পোল্ট্রির দেহে যেসব রোগের সৃষ্টি হয় তাদের নাম বলতে পারবেন।
- ভিটামিনের অভাব হলে পোল্ট্রির দেহে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

পোল্ট্রির খাদ্যে পরিমিত পরিমাণে ভিটামিন না থাকলে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের উপসর্গ দেখা যায়।

পোল্ট্রিতে ভিটামিনের অভাব

পোল্ট্রির খাদ্যে ভিটামিন সরবরাহ করা না হলে অথবা খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ ভিটামিন না থাকলে এদের দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। অতিরিক্ত পারিমাণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat Soluble Vitamins), যেমন– ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে পোল্ট্রির দেহের কোষে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। সাময়িকভাবে খাদ্যে এসব ভিটামিন সরবরাহ করা না হলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। তবে দেহে এদের সংরক্ষণ ভান্ডার শেষ হয়ে গেলে অথবা খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা না হলে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে, দেহে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পরিমাণ পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water Soluble Vitamins) পোল্ট্রির দেহের কোষে মজুদ থাকে না। এ অতিরিক্ত ভিটামিন প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। তাই খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত মাত্রায় এসব ভিটামিন প্রত্যহ সরবরাহ করা দরকার। তা না হলে পোল্ট্রির দেহে দ্রুত এসব ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর মধ্যে পোল্ট্রিতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব ঘটতে দেখা যায়। ভিটামিন সি এর অভাব তেমন একটা ঘটে না। এখানে পোল্ট্রিতে বিভিন্ন ভিটামিনের আভাবজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগব্যাধি–

পাখির চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং প্রজননের জন্য ভিটামিন এ একান্ত জরুরি।

ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin A Deficiency)

পাখির খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন এ এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, পাখির চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং প্রজননের জন্য ভিটামিন এ একান্ত জরুরি। দেহে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন এ পাখির যকৃতে জমা থাকে। কখনও খাদ্যে এর অভাব হলে যকৃতে জমাকৃত ভিটামিন এ ব্যবহৃত হয়।

ভিটামিন এ এর অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখির দেহে ভিটামিন এ এর অভাব হতে পারে। যেমন–

- যকৃতে জমাকৃত ভিটামিন এ এর ভান্ডার শেষ হলে।
- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা না হলে।
- খাদ্যের উপকরণসমূহের মিশ্রণ ঠিকমতো না হলে।
- মিশ্রিত খাদ্যে ভিটামিন এ জারণ বা অক্সিডেশনের মাধ্যমে নষ্ট হলে।
- পাখি ককসিডিওসিস ও কৃমি রোগে আক্রান্ত হলে।

লক্ষণ

ভিটামিন এ এর অভাবে পাখির দৃষ্টিশক্তি, ডিম উৎপাদন, বাচ্চা ফোটার হার, দৈহিক বৃদ্ধি ইত্যাদি কমে যায়।

ভিটামিন এ এর অভাবে পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–

- চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। চোখের পাতা ফুলে যায় এবং চোখের মধ্যে আঠার মতো তরল পদার্থ জমে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায় এবং ডিমের মধ্যে অধিক হারে রক্তের ছিটা পাওয়া যায়।
- ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায় এবং ডিমের মধ্যে বাচ্চা মারা যায়। কারণ, ভিটামিন এ এর অভাবে ভ্রূণের রক্তনালি তৈরি হয় না।
- মুখ ও গলনালির মিউকাস পর্দায় হাইপারক্যারাটোসিস (Hyperkeratosis) দেখা যায়।
- বাড়ন্ত পাখির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- চামড়া, মাথার ঝুঁটি, গলার ফুল নীলাভ ও শুষ্ক হয়।

চিত্র ৪৭ ঃ ভিটামিন এ এর অভাবে মুরগির মুখগহ্বরে হাইপারক্যারাটোসিস (সাদা দাগগুলো)

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নিম্নলিখিতভাবে করতে হবে। যথা–

- খাদ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন এ সরবরাহ করতে হবে। মুরগির প্রতি কেজি খাদ্যে ৮,০০০ থেকে ১৫,০০০ আই.ইউ. মাত্রায় ভিটামিন এ সরবরাহ করা দরকার।
- বাজারে আজকাল ভিটামিন এ, ডি, ই দ্রবণ আকারে পাওয়া যায়। ১ মি.লি. দ্রবণ ৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাখিকে ৩–৫ দিন পান করালে ভিটামিনের অভাব দূর হয়।
- তাছাড়া শাকশবজি, মাছের তেল, ভুট্টা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ পাওয়া যায়। এগুলো খাওয়ালে ভিটামিন এ এর অভাব দূর হয়।

পাখির দেহে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়।

ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin D Deficiency)

ভিটামিন ডি এর বিভিন্ন গঠন বা ফর্ম (Form) রয়েছে। এর মধ্যে ভিটামিন ডি$_3$ পাখির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি পাখির দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাকে সহায়তা করে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাখির অস্থি গঠন এবং ডিমের খোসা তৈরি করে। পাখির দেহে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখির দেহে ভিটামিন ডি এর অভাব হতে পারে। যেমন–

- খাদ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি$_3$ সরবরাহ না করলে।
- খাদ্যে সালফারজাতীয় ওষুধ সরবরাহ করলে। কারণ, সালফারজাতীয় ওষুধ ভিটামিন ডি এর কাজে বাধা দেয়।
- খাদ্যে অক্সিডেশনের মাধ্যমে ভিটামিন ডি নষ্ট হলে।

লক্ষণ

ভিটামিন ডি এর অভাবে পাখিতে 'রিকেট' রোগ হয়।

ভিটামিন ডি এর অভাবে পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়। যথা–

- পায়ের অস্থি নরম, মোটা ও বাঁকা হয়ে যায়। ফলে পাখি ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। এটিকে পাখির 'রিকেট' রোগ বলা হয়। ঠোঁট, হাড় এবং পায়ের নখ নরম হয়ে যায়। ফলে পাখি হাটুর উপর ভর দিয়ে চলে।
- পাখির বুকের পাঁজর ফুলে যায় যা রিকেটি রোসারি (Ricketty Rosary) নামে পরিচিত।
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- ডিমের উৎপাদন ও উর্বরতা হ্রাস পায়। ডিমের খোসা পাতলা হয়।

চিত্র ৪৮ ঃ ভিটামিন ডি এর অভাবে মুরগিতে রিকেটি রোসারি

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ডি$_3$ খাদ্যে সরবরাহ করতে হবে। মুরগির প্রতি কেজি খাদ্যে ১৫,০০০–২৫,০০০ আই.ইউ. মাত্রায় ভিটামিন ডি$_3$ সংযোজন করা প্রয়োজন।
- খাদ্যে ভিটামিন ডি$_3$ এর সাথে যাতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পরিমাণমতো থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- বাজারের ভিটামিন এ, ডি, ই দ্রবণ পাওয়া যায়। ১ মি.লি. দ্রবণ ৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করালে রোগ সেরে যায়।
- পাখির ঘরে যাতে সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, সূর্যের আলো ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে।

ভিটামিন ই এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin E Deficiency)

পাখির প্রজনন ক্ষমতা এবং ডিমের উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য ভিটামিন ই অত্যাবশ্যকীয়।

পাখির প্রজনন ক্ষমতা এবং ডিমের উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য খাদ্যে ভিটামিন ই অত্যাবশ্যকীয়। ভিটামিন ই শরীরের বিভিন্ন কলা ও কোষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এটি দেহে সেলিনিয়ামের কার্যকারিতা ঠিক রাখে। তাই পখির খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখিতে ভিটামিন ই এর অভাব হতে পারে। যেমন–

- খাদ্যমধ্যস্থিত ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন ঘটলে।
- খাদ্যের মিশ্রণ ঠিকমতো না হলে।
- খদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই সরবরাহ করলে।
- ভুট্টাজাতীয় খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণকারী উপাদান হিসেবে প্রোপিওনিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে।
- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেলিনিয়াম না থাকলে।

লক্ষণ

ভিটামিন ই এর অভাবে মুরগির বাচ্চাতে এনসেফালোম্যালাসিয়া রোগ হয়।

ভিটামিন ই এর অভাবে পাখিতে নিম্নে বর্ণিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার হার কমে যায় এবং ডিম বসানোর ৪র্থ দিনে ডিমের ভিতরে ভ্রূণ মারা যায়।
- মুরগির বাচ্চাতে এনসেফালোম্যালাসিয়া (Encephalomalacia) রোগ হয়। এ রোগে মুরগির বাচ্চার মাথার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং জায়গাগুলো নরম হয়ে যায়। ফলে এরা মাথা ও ঘাড় পিছনের দিকে অথবা সামনের দিকে বাঁকা করে রাখে। এটি ক্রেজি চিক ডিজিজ (Crazy Chick Disease) নামেও পরিচিত।
- পখির প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।
- বুক ও উরুর (Thigh) মাংসপেশি শুকিয়ে যায়।
- চামড়ার নিচের কলায় পানি জমার কারণে ফুলে যায়। একে সাবকিউটেনিয়াস ইডিমা (Subcutaneous Oedema) বলে।

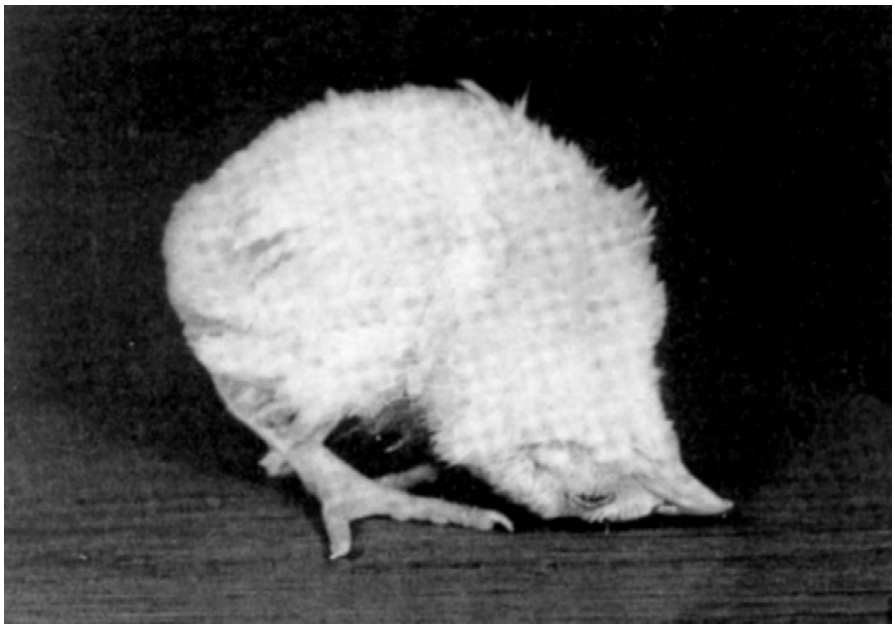

চিত্র ৪৯ ঃ ভিটামিন ই এর অভাবে বাচ্চা মুরগির ক্রেজি চিক ডিজিজ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

- ভিটামিন এ, ডি, ই দ্রবণ ৪ লিটার পানিতে ১ মি.লি. মাত্রায় মিশিয়ে ৩–৫ দিন পান করাতে হয়।
- প্রতি কেজি খাদ্যে ২০–৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই মিশালে এর অভাব হয় না।
- খাদ্যে অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করা যাবে না।
- খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সেলিনিয়াম সরবরাহ করতে হবে।
- খাদ্য সংরক্ষণের জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

ভিটামিন কে হচ্ছে রক্তক্ষরণ বন্ধকরণ ভিটামিন।

ভিটামিন কে এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin K Deficiency)

ভিটামিন কে হচ্ছে রক্তক্ষরণ বন্ধকরণ ভিটামিন, যা প্রোথ্রোমবিন (Prothrombin) তৈরিতে সাহায্য করে। প্রোথ্রোমবিন রক্ত জমাটবাঁধার জন্য একান্ত দরকারী।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখিতে ভিটামিন কে এর অভাব হতে পারে। যেমন–

- খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন কে থাকলে।
- অনেকদিন ধরে রেখে দেয়া খাদ্য পাখিকে খাওয়ালে। কারণ, খাদ্য অনেকদিন রাখলে ভিটামিন কে নষ্ট হয়।
- খাদ্য বা পানির মাধ্যমে সালফারজাতীয় ওষুধ খাওয়ালে। কারণ, সারফারজাতীয় ওষুধ ভিটামিন কে এর বিপাকীয় কার্যে ব্যাঘাত ঘটায়।
- অনেকদিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ালে। কারণ, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ অন্ত্রের ঐসব জীবাণুকে ধ্বংস করে যারা ভিটামিন কে তৈরিতে সাহায্য করে।

লক্ষণ

ভিটামিন কে এর অভাবে শরীরের কোনো অংশ কোনো কারণে কেটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।

ভিটামিন কে এর অভাবে পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- শরীরের কোনো অংশ কোনো কারণে কেটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।
- ঠোঁট কাটার সময় রক্তপাত ঘটলে তা বন্ধ হয় না।
- রক্তপাতের ফলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং পাখি মারা যেতে পারে।

চিত্র ৫০ ঃ ভিটামিন কে এর অভাবে মুরগিতে রক্তশূন্যতা বা অ্যানেমিয়া

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে সরবরাহ করতে হবে। মুরগির প্রতি কেজি খাদ্যে ৩–৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন কে সরবরাহ করা দরকার।
- যথাসম্ভব অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফারজাতীয় ওষুধ পরিহার করা দরকার।
- রক্তক্ষরণ ঘটলে ভিটামিন কে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর নাম এবং তাদের প্রয়োজনীতা খাতায় লিখুন।*

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগব্যাধি

ভিটামিন বি$_1$ (থায়ামিন) এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_1 Deficiency)

শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ভিটামিন বি$_1$ অত্যাবশ্যক।

পাখির দেহে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক রাখার জন্য শর্করাজাতীয় খাদ্যের দরকার। আর শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ভিটামিন বি$_1$ অত্যাবশ্যক। তাছাড়া ক্ষুধা বাড়ানো এবং এনজাইম তৈরিতে ভিটামিন বি$_1$ এর গুরুত্ব রয়েছে। সব বয়সের মুরগিতে ভিটামিন বি$_1$ এর অভাব দেখা দেয়। তবে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এর তীব্রতা অধিক।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পোল্ট্রিতে ভিটামিন বি$_১$ এর অভাব হয়। যথা–

- খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি$_১$ সরবরাহ করলে।
- খাদ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্যোপাদান বেশি এবং ভিটামিন বি$_১$ এর পরিমাণ কম হলে।

লক্ষণ

ভিটামিন বি$_১$ এর অভাবে পাখি পা বাঁকা করে ঘাড় পিছনের দিকে ঘুরিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে থাকে।

আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা–

- আক্রান্ত পাখি পা বাঁকা করে ঘাড় পিছনের দিকে ঘুরিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে থাকে।
- পা, ডানা ও ঘাড় অবশ হয়ে যায়।
- ক্ষুধামন্দা দেখা যায়। ওজন কমে যায় ও চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

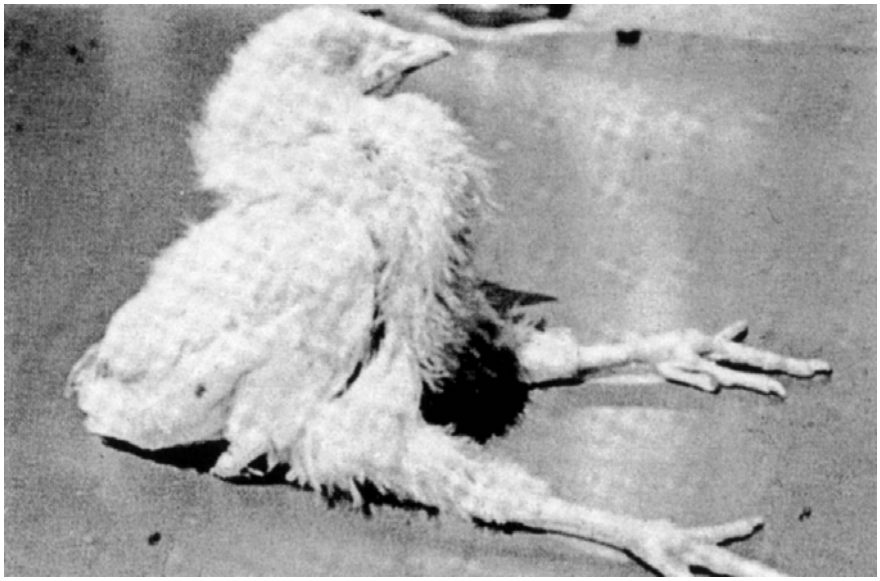

চিত্র ৫১ ঃ ভিটামিন বি$_১$ এর অভাবে বাচ্চা মুরগিতে অবশতা

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে ভিটামিন বি$_১$ এর অভাব দূর করা যায়। যথা–

- প্রতি কেজি খাদ্যে ১–৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি$_১$ সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না।
- বিভিন্ন ভেটেরিনারি ওষুধ কোম্পানির ভিটামিন বি$_১$ মিশ্রিত মাল্টিভিটামিন রয়েছে, যা খাবার পানির সাথে সপ্তাহে ৩ দিন পান করালে ভালো ফল পাওয়া যায়। যেমন– অলভিট এম.এ. (ব্রেমার ফার্মা), এমবাভিট ডব্লিউ.এস. (রোন পোলেন্ক), সলমিনভিট (ইন্টারভেট) ইত্যাদি।
- চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন বাড়ন্ত বাচ্চার ক্ষেত্রে ৫–১০ মিলিগ্রাম এবং বয়স্ক মুরগির জন্য ১০–৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ভিটামিন বি$_১$ সরবরাহ করতে হবে।

দেহের জারন ও বিজারণ ক্রিয়া সম্পাদন, ডিমের সংখ্যা ও উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন বি$_২$ প্রয়োজন।

ভিটামিন বি$_২$ (রাইবোফ্লাভিন) এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_2 Deficiency)

দেহের জারন বা অক্সিডেশন ও বিজারন বা রিডাকশন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ভিটামিন বি$_২$ এর একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ডিমের সংখ্যা এবং উর্বরতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন বি$_২$ এর প্রয়োজন হয়।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখিদেহে ভিটামিন বি$_২$ এর অভাব হয়। যথা–

- খাদ্যে ভিটামিন বি$_২$ অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে।
- খাদ্যের পি.এইচ. বেশি হলে ভিটামিন বি$_২$ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এর অভাব দেখা দেয়।

লক্ষণ

ভিটামিন বি$_২$ এর অভাবে কার্লড-টো-প্যারালাইসিস রোগ হয়।

পাখিদেহে এ ভিটামিনের অভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। যথা–

- পাখির পায়ের নখ বা আঙ্গুল বাঁকা হয়ে যায়। ফলে পাখি খুঁড়িয়ে চলে। একে কার্লড-টো-প্যারালাইসিস (Curled-Toe-Paralysis) রোগ বলে।
- বাড়ন্ত পাখির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, পালক কম গজায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।
- ডিমের সংখ্যা এবং উর্বরতা কমে যায়।
- ডিমের ভিতরে দুই সপ্তাহ বয়সের ভ্রূণ মারা যায়।

চিত্র ৫২ ঃ ভিটামিন বি$_২$ এর অভাবে বাচ্চা মুরগির কালর্ড-টো-প্যারালাইসিস রোগ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- মুরগির প্রতি কেজি খাদ্যে ৫–৮ মিলিগ্রাম মাত্রায় ভিটামিন বি$_২$ সরবরাহ করতে হবে।
- আক্রান্ত বাচ্চাকে দৈনিক ৫ মিলিগ্রাম এবং বড় মুরগিকে দৈনিক ১০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ভিটামিন বি$_২$ খাওয়ালে এ রোগ ভালো হয়।

ভিটামিন বি$_৬$ আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়ার জন্য দরকার।

ভিটামিন বি$_৬$ (পাইরিডক্সিন) এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin B_6 Deficiency)

ভিটামিন বি$_৬$ আমিষ, শর্করা এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দরকার হয়।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখিতে ভিটামিন বি$_৬$ এর অভাব হয়। যথা–

- খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিনে বি$_৬$ থাকলে।
- খাদ্যে আমিষের তুলনায় ভিটামিন বি$_৬$ কম হলে।

লক্ষণ

ভিটামিন বি$_{৬}$ এর অভাবে পাখির দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।

ভিটামিন বি$_{৬}$ এর অভাবে পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- বাচ্চা মুরগির চোখের পাতায় প্রদাহ হয় ও পানি জমে বা ইডিমা হয়।
- পালক উসকোখুশকো হয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- দেহে খিঁচুনি হয় এবং লেজের গোড়া সবসময় সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।
- পালক নিচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং মাথা নিচের দিকে করে রাখে।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

ক– বাচ্চা পোল্ট্রির চোখে প্রদাহ ও ইডিমা

খ– বয়স্ক পোল্ট্রির ঝুলে পড়া পাখা ও নিচু করে রাখা মাথা

চিত্র ৫৩ (ক, খ) ঃ পোল্ট্রিতে ভিটামিন বি$_{৬}$ এর অভাবে সৃষ্ট উপসর্গ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ভিটামিন বি$_{৬}$ এর অভাব নিম্নলিখিতভাবে দূর করা যেতে পারে। যথা–

- প্রতি কেজি খাদ্যে ৪–৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি$_{৬}$ সরবরাহ করলে পাখির দেহে এর অভাব হয় না।
- বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন– অলভিট এম.এ. (ব্রেমার ফার্মা), এমবাভিট ডব্লিউ.এস. (রোন-পোলেন্ক) এবং সলমিনভিট (ইন্টারভেট) পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে পান করালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্যানটোথেনিক অ্যাসিড আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করে।

প্যানটোথেনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত রোগ (Pantothenic Acid Deficiency)

প্যানটোথেনিক অ্যাসিড অনেক প্রোটিন অণুর সাথে যুক্ত থাকে এবং এটি আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করে। বাড়ন্ত ও বাচ্চা পাখিতে এ ভিটামিনের চাহিদা অনেক বেশি।

কারণ

খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড থাকলে এর অভাব দেখা দেয়।

লক্ষণ

এর অভাবে পখিতে নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যথা–

- বাড়ন্ত পাখির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং পালক কম গজায়।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গার চামড়ায় প্রদাহ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়।
- ডিম উৎপাদন ও ফোটার হার কমে যায়।
- চোখ আঠাযুক্ত ও বন্ধ হয়ে যায়।
- ডিমের ভিতরে প্রথম সপ্তাহের ভ্রূণ মারা যায়।

ক– বাচ্চা মুরগির আঠাযুক্ত ও বন্ধ চোখ খ– মুরগির পায়ে চামড়াপ্রদাহ ও ক্ষত

চিত্র ৫৪ (ক, খ) ঃ মুরগিতে প্যানটোথেনিক অ্যাসিডের অভাবে সৃষ্ট উপসর্গ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

এ ভিটামিনের অভাব নিম্নোক্তভাবে পূরণ করা যায়। যথা–

- চিকিৎসার জন্য প্রতিটি পাখিকে প্রতিদিন ১০–২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্যানটোথেনিক অ্যাসিড খাওয়াতে হবে।
- প্রতি কেজি খাদ্যে ১০–১৫ মিলিগ্রাম প্যানটোথেনিক অ্যাসিড সরবরাহ করলে এ রোগ হয় না।

নিয়াসিনের অভাবজনিত রোগ (Niacin Deficiency)

চর্বি ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নিয়াসিনের দরকার হয়।

আমিষ, চর্বি ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নিয়াসিনের দরকার হয়। নিয়াসিনের সাথে ট্রিপটোফেন এবং পাইরিডক্সিনের সম্পর্ক রয়েছে। পাখির দেহের ভিতরে পাইরিডক্সিনের সহায়তায় ট্রিপটোফেন হতে নিয়াসিন সৃষ্টি হয়। তাই খাদ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রিপটোফেন ও পাইরিডক্সিন থাকে তাহলে নিয়াসিনের অভাব হয় না।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিতভাবে নিয়াসিনের অভাব হতে পারে। যথা–

- খাদ্যে ট্রিপটোফেন ও পাইরিডক্সিনের অভাব হলে।
- অপর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়াসিন সরবরাহ করলে।
- খাদ্য ঠিকমতো না মিশালে।
- খাদ্য শোষণ কম হলে।

লক্ষণ

আক্রান্ত পাখিতে হক সন্ধি ফুলে যায় ও দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।

আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- পাখির হক সন্ধি (Hock Joint) ফুলে যায়। ফলে চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়।
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না।
- জিহ্বা লাল হয় এবং তাতে ফোস্কা পড়ে।
- পালক কম গজায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিয়াসিনের অভাব নিম্নলিখিতভাবে দূর করা যায় । যথা–

- প্রতি কেজি খাদ্যে ৩০–৫০ মিলিগ্রাম নিয়াসিন দিলে এর অভাব হয় না ।
- বাজারের অলভিট এম.এ., এমবাভিট ডব্লিউ.এস. অথবা সলমিনভিট পানির সাথে মিশিয়ে পান করালে ভালো ফল পাওয়া যায় ।

দেহের কার্বক্সিলেশন এবং ডিকার্বক্সিলেশন ক্রিয়ার জন্য বায়োটিন দরকার ।

বায়োটিনের অভাবজনিত রোগ (ইরড়ঃরহ উবভরপরবহপু)

পাখির অন্ত্রনালির মধ্যে বায়োটিন তৈরি হয়। দেহের কার্বক্সিলেশন (Carboxylation) এবং ডিকার্বক্সিলেশন (Decarboxylation) ক্রিয়ার জন্য বায়োটিন দরকার ।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে বায়োটিনের অভাব হয়ে থাকে । যথা–

- অধিক পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে অন্ত্রে বায়োটিন তৈরিকারী ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে, ফলে এর অভাব দেখা দেয় ।
- খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে বায়োটিন সরবরাহ করলে ।
- খাদ্যে বায়োটিন নষ্টকারী পদার্থ থাকলে ।

লক্ষণ

বায়োটিনের অভাবে পাখির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ।

বায়োটিনের অভাবে পাখিতে নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । যথা–

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, পালক ভেঙ্গে যায় এবং চামড়া শুষ্ক হয়ে যায় ।
- মুখ ও পায়ের গোড়ার চামড়া উঠে যায় ।

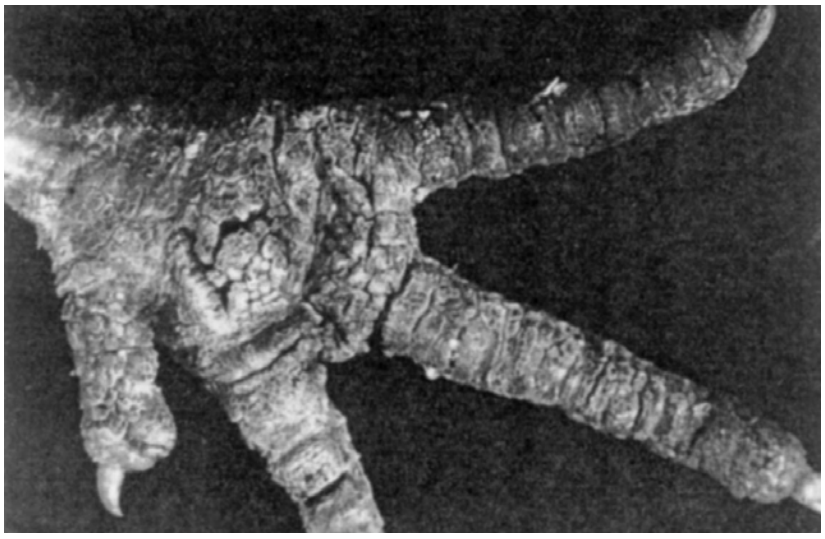

চিত্র ৫৫ ঃ বায়োটিনের অভাবে মুরগির পা ফাটা ও চর্মপ্রদাহ

- চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায় ।
- ডিমের ভিতরে ভ্রূণ মারা যায় ।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

বায়োটিনের অভাব নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করা যায়। যথা–

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়োটিন সরবরাহ করতে হবে। প্রতি কেজি খাদ্যে ০.২–০.৬ মিলিগ্রাম বায়োটিন সরবরাহ করলে এর অভাবজনিত রোগ হবে না।
- অধিক পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো যাবে না।
- খাদ্য সঠিকভাবে গুদামজাত করতে হবে যাতে বায়োটিন নষ্ট না হয়।

কোলিন লেসিথিন তৈরিতে সহায়তা করে।

কোলিনের অভাবজনিত রোগ (Choline Deficiency)

কোলিন যকৃতের চর্বি থেকে লেসিথিন (Lecithin) নামক ফসফোলিপিড তৈরিতে সহায়তা করে। ফলে পাখির যকৃতে চর্বি জমা হতে পারে না।

কারণ

খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে কোলিন সরবরাহ করলে এর অভাব হয়।

লক্ষণ

কোলিনের অভাবে পাখিতে প্যারোসিস ও ফ্যাটি লিভার হিমোরেজিক সিন্ড্রোম রোগ হয়।

কোলিনের অভাবে পাখিতে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা দেয়। যথা–

- দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।
- প্যারোসিস (Perosis) রোগ হয়।
- ফ্যাটি লিভার হিমোরেজিক সিন্ড্রোম (Fatty Liver Haemorrhagic Syndrome) দেখা দেয়।
- ডিমের সংখ্যা ও উর্বরতা হ্রাস পায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

কোলিনের অভাবজনিত রোগ নিম্নোক্তভাবে দূর করা যায়। যথা–

- বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন প্রিমিক্স হিসেবে অলভিট এম.এ., এমবাভিট ডব্লিউ.এস. অথবা সলমিনভিট পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে পান করাতে হবে।
- প্রতি কেজি খাদ্যে ৫০০–৮০০ মিলিগ্রাম কোলিন সরবরাহ করতে হবে।

ফোলিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে।

ফোলিক অ্যাসিডের অভাব (Folic Acid Deficiency)

ফোলিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে। দৈহিক বৃদ্ধি, মাংসপেশি গঠন, রক্ত ও পালক তৈরিতে ফোলিক অ্যাসিডের দরকার হয়।

অভাবের কারণ

নিম্নোক্ত কারণে পাখির দেহে ফোলিক অ্যাসিডের অভাব হয়। যেমন–

- খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফোলিক অ্যাসিড থাকলে।
- খাদ্য সংরক্ষণ ঠিকমতো না হলে।

ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে পাখিতে পালকের রঙ নষ্ট হয়, চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ

ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেমন–

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- পালক কম গজায় এবং রঙিন পাখির পালকের রঙ নষ্ট হয়ে যায়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

- চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- ডিমে ভ্রূণ মারা যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে ফোলিক অ্যাসিডের অভাব পূরণ করা যায়। যেমন–

- প্রতি কেজি খাদ্যে ১–২ মিলিগ্রাম ফোলিক অ্যাসিড সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না।
- বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন প্রিমিক্স খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি$_{১২}$ রক্তের লোহিত-কণিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাব (Vitamin B_{12} Deficiency)

ভিটামিন বি$_{১২}$ রক্তের লোহিতকণিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তাছাড়া ডিম ফোটা ও মাংসময় পাকস্থলী বা গিজার্ডের (Gizzard) ক্ষত রোধের জন্য ভিটামিন বি$_{১২}$ দরকার।

ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাবে পাখিতে দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ

এর অভাবে পাখিতে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- ডিমের মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে। সাধারণত ১৭ দিন বয়সের ভ্রূণের মৃত্যু হয়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- পেরোসিস রোগ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাবজনিত রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য প্রতি কেজি খাদ্যে ০.০২–০.০৪ মিলিগ্রাম মাত্রায় এটি সরবরাহ করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে পাখির দেহে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তা ছক আকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রির দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। পরিমিত পরিমাণ আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও খণিজপদার্থ মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা হয়। খাদ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করা না হলে পাখির দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। পোল্ট্রির দেহে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব হতে পারে। এসব ভিটামিনের অভাবে এদের দেহে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। ফলে উৎপাদন কমে যায়। এমনকী পোল্ট্রি মারাও যেতে পারে। খাদ্য ও পানির সঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রায় ভিটামিন যোগ করে অথবা ইনজেকশন আকারে বিভিন্ন ভিটামিন পোল্ট্রির দেহে প্রয়োগ করে ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গ দূর করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্ ভিটামিনের অভাবে এনসেফালোম্যালাসিয়া রোগ হয়?

i) ভিটামিন ই এর অভাবে
ii) ভিটামিন বি$_{২}$ এর অভাবে
iii) ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে
iv) নিয়াসিনের অভাবে

খ. ভিটামিন বি$_{১}$ এর অপর নাম কী?

i) থায়ামিন
ii) রাইবোফ্লাভিন
iii) পাইরিডক্সিন
iv) প্যানটোথেনিক অ্যাসিড

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ভিটামিন এ এর অভাবে চোখের দৃষ্টি কমে যায়।
খ. অধিক পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে বায়োটিনের অভাব হয় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ভিটামিন ডি এর অভাবে পাখির _____ রোগ হয়।
খ. প্রতি কেজি খাদ্যে _____ মিলিগ্রাম কোলিন সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ ভিটামিন প্রোথ্রোবিন তৈরিতে সাহায্য করে?
খ. ভিটামিন বি$_{২}$ এর অভাবে কী রোগ হয়?

পাঠ ৫.২ খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির দেহে প্রয়োজনীয় খণিজপদার্থগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রির দেহে খণিজপদার্থের অভাব হলে যেসব উপসর্গ দেখা দেয়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ

পোল্ট্রির দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রজননের জন্য খণিজপদার্থ অত্যাবশ্যক।

আমিষ, শর্করা, চর্বি এবং ভিটামিনের মতো পোল্ট্রির খাদ্যে খণিজপদার্থের একান্ত প্রয়োজন। পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রজননের জন্য খণিজপদার্থ অত্যাবশ্যক। তবে, অধিক পরিমাণ খণিজপদার্থ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই পরিমিত পরিমাণ খণিজপদার্থ খাদ্যের মধ্যে সরবরাহ করতে হয়। তা না হলে এদের অভাবে পাখির দেহে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেবে। এখানে বিভিন্ন প্রকার খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব (Calcium and Phosphorus Deficiency)

পাখির দেহের অস্থি গঠন এবং ডিমের খোসা তৈরিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সাহায্য করে থাকে।

পোল্ট্রির দেহের অস্থি গঠন এবং ডিমের খোসা তৈরিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া দেহের অম্ল-ক্ষারক (Acid-base) সমতা রক্ষা করার জন্য এদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও ক্যালসিয়াম রক্ত জমাটবাঁধতে এবং ফসফরাস শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি এর উপস্থিতি ছাড়া এরা কার্য সম্পাদন করতে পারে না। খাদ্যে এদের তিনটির মধ্যে একটির অভাব দেখা দিলে রিকেট রোগ দেখা দেয়, ডিমের খোসা পাতলা হয়, ডিমের সংখ্যা কমে যায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- ঠোঁট নরম ও বাঁকা হয়।
- ক্যালসিয়ামের অভাবে রক্তক্ষরণ এবং অস্থি স্প্রিংয়ের মতো হয়।
- ফসফরাসের অভাবে অস্থি রাবারের মতো হয়।

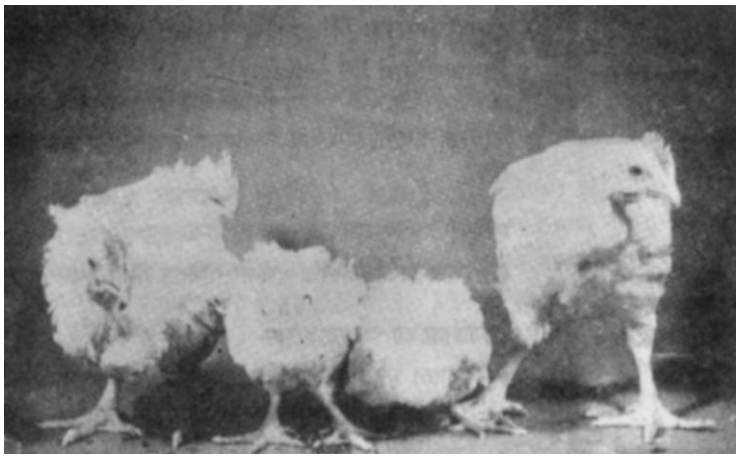

চিত্র ৫৬ ঃ মুরগিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে সৃষ্ট উপসর্গ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব দূর করা যায়। যথা–

- পাখির খাদ্যে ১–৩% ক্যালসিয়াম এবং ০.৪–০.৫% ফসফরাস সরবরাহ করলে এদের অভাব হয় না।
- খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত হওয়া দরকার যথাক্রমে–

  বাচ্চা মুরগিতে = ২.২ ঃ ১

  বাড়ন্ত মুরগিতে = ২.৫ ঃ ১

  ডিমপাড়া মুরগিতে = ৯ ঃ ১

ম্যাঙ্গানিজের অভাব (Manganese Deficiency)

দেহের অস্থি গঠন, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন ও উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন।

পাখির দেহের অস্থি গঠন, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন ও উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। খাদ্যে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে দেহে এর অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়।

লক্ষণ

ম্যাঙ্গানিজের অভাবে পাখিতে পেরোসিস রোগ হয়।

ম্যাঙ্গানিজের অভাবে পাখিদেহে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যথা–

- বাড়ন্ত মুরগির পায়ের অস্থি খাটো এবং মোটা হয়।
- বড় মুরগির পায়ের টিবিয়া (Tibia) অস্থি পাক খেয়ে (Twisting) যায় এবং টিবিও-মেটাটারসাল (Tibio-metatarsal) অস্থি ঠিকমতো লাগে না, ফলে টেন্ডন (Tendon) তার আসল জায়গা থেকে পিছলে একপার্শ্বে সার যায়। একে পেরোসিস (Perosis) রোগ বলে। এ রোগের ফলে মুরগি বেশ কষ্ট করে চলাফেরা করে।
- ডিমের উৎপাদন ও উর্বরতা কমে যায়। পাতলা খোসাসম্পন্ন ডিমের সংখ্যা বেড়ে যায়।
- ডিমের ভিতর ২০–২১ দিনের বাচ্চা মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের প্রতিকার করা যায়। যথা–

- প্রতি কেজি পাখির খাদ্যে ৫০–৭০ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গনিজ সালফেট অথবা অক্সাইড হিসেবে সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না।

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়ামের অভাব (Sodium, Chlorine and Potassium Deficiency)

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়াম পাখির দেহের অম্ল-ক্ষারক সমতা রক্ষা করে।

এ তিন ধরনের খণিজপদার্থ পাখির দেহের অম্ল-ক্ষারক সমতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া হৃৎপিন্ডের কার্য সম্পাদন ও অস্থি গঠনের জন্য পটাসিয়াম দরকার।

লক্ষণ

পাখিতে সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়ামের অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, কর্নিয়াল ক্যারাটিনাইশেজন, স্নায়ুতন্ত্রের উপসর্গ এবং হৃৎপিন্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশি দুর্বল হয়।

এগুলোর অভাবজনিত লক্ষণ পাখিতে নিম্নলিখিতভাবে দেখা যায়। যথা–

সোডিয়ামের অভাব হলে–

- বাচ্চা মুরগিতে সোডিয়ামের অভাব হলে দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না, অস্থি নরম হয়, কর্নিয়াল ক্যারাটিনাইজেশন (Corneal Keratinization) দেখা দেয়।
- বড় মুরগিতে এর অভাব হলে ডিম উৎপাদন কমে যায়, ডিমের আকার ছোট হয়, এক মুরগি অন্য মুরগিকে ঠোকরায়।

ক্লোরিনের অভাব হলে–

- দৈহিক বৃদ্ধি একেবারে কমে যায়।
- স্নায়ুতন্ত্রের উপসর্গ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে হঠাৎ মুরগি মাটিতে পড়ে যায়, খিঁচুনি হয় এবং পা পিছনের দিকে টানটান অবস্থায় রাখে।

পটাসিয়ামের অভাব হলে–

- মাংসপেশি, বিশেষ করে হৃৎপিন্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসের পেশিগুলো, দুর্বল হয়ে যায় এবং এদের কার্যক্ষমতা কমে যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- মুরগির খাদ্যে ০.১৫–০.২% সোডিয়াম, ০.১৫% ক্লোরিন এবং ০.৪% পটাসিয়াম সরবরাহ করলে এদের অভাব হয় না।
- সোডিয়াম ও ক্লোরিনের অভাব পূরণের জন্য খাদ্যের মধ্যে সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) সরবরাহ করা যায়।

পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো এবং ডিম উৎপাদনের জন্য জিঙ্কের প্রয়োজন।

জিঙ্কের অভাব (Zinc Deficiency)

পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো এবং ডিম উৎপাদনের জন্য জিঙ্কের প্রয়োজন। তাছাড়া দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য জিঙ্কের দরকার। খাদ্যে জিঙ্ক অপর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করলে এর অভাব দেখা দেয়।

খাদ্যে জিঙ্কের অভাব হলে দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে, পালক কম গজায়।

লক্ষণ

খাদ্যে জিঙ্কের অভাব হলে–

- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- পালক কম গজায়।
- পায়ের চামড়া উঠে যায়।
- পায়ের অস্থি খাটো ও মোটা হয়।
- ডিমের মধ্যে ভ্রূণের মেরুদন্ড, দেহপ্রাচীর এবং পা গঠিত হয় না।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

এর অভাব দূর করার জন্য–

- প্রতি টন খাদ্যে ১৫–৩০ গ্রাম জিঙ্ক (কার্বনেট অথবা অক্সাইড হিসেবে) সরবরাহ করতে হবে।
- চিকিৎসার জন্য খাদ্যে জিঙ্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাক ও এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাব (Magnesium Deficiency)

শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়া সম্পাদন এবং এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন হয়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কর্ম সম্পাদনের জন্যও ম্যাগনেসিয়ামের দরকার।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে বাড়ন্ত মুরগির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

লক্ষণ

ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে পাখির দেহে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তা হলো–

- বাড়ন্ত মুরগির দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং মৃত্যু হার বেড়ে যায়।
- বাচ্চা মুরগি দুর্বল হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপসর্গের কারণে দেহে কাঁপুনি ওঠে।
- ডিমপাড়া মুরগির ডিমের সংখ্যা কমে যায় ও ডিমের আকার ছোট হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য–

- খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহ করতে হবে।
- খাদ্যে ০.৫% ম্যাগনেসিয়াম থাকলে এর অভাব হয় না।

সেলিনিয়াম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

সেলিনিয়ামের অভাব (Selenium Deficiency)

সেলিনিয়াম হচ্ছে গ্লুটাথায়োন পারোক্সিডেজ (Glutathion Peroxidase) নামক এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পাখিদেহে সেলিনিয়ামের অভাব হয়। যথা–

- সেলিনিয়ামের অভাবজনিত মাটিতে জন্মানো খাদ্য উপকরণ দিয়ে পাখির খাদ্য তৈরি করলে।
- খাদ্যের মধ্যে সালফার অথবা অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে।
- ভিটামিন ই খাদ্যে কম থাকলে।

লক্ষণ

সেলিনিয়ামের অভাবে কনজেনিটাল হোয়াইট মাসেল ডিজিজ ও একজুডেটিভ ডায়াথেসিস রোগ হয়।

সেলিনিয়ামের অভাবে–

- ৩–৪ দিনের মুরগির বাচ্চার "কনজেনিটাল হোয়াইট মাসেল ডিজিজ" হয়। এতে গিজার্ডের মাংসের অবক্ষয় দেখা দেয়।
- একজুডেটিভ ডায়াথেসিস রোগ হয়। এক্ষেত্রে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে অর্থাৎ চামড়ার নিচের কলায় পানি জমে। ক্রপ বা খাদ্যথলি নরম হয় এবং ফুলে যায়। গিজার্ড ও হৃৎপিন্ডের মাংসপেশির অবক্ষয় ঘটে।
- দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- ডিমের উৎপাদন ও উর্বরতা লোপ পায়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

প্রতি কেজি খাদ্যে ০.১৫–০.৪ মিলিগ্রাম সেলিনিয়াম সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না।

অনুশীলন (Activity) *ঃ পাখির দেহে প্রয়োজনীয় খণিজপদার্থগুলোর নাম এবং কার্যকারিতা লিখুন।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রির খাদ্যে ভিটামিনের মতো খণিজপদার্থেরও প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। এরা দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। তাই খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খণিজপদার্থ সরবরাহ করা দরকার। অপর্যাপ্ত বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ খণিজপদার্থ খাদ্যে থাকলে পোল্ট্রির দেহে এগুলোর অভাবজনিত উপসর্গ দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রকার খণিজের অভাবে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। তবে, খাদ্যে খণিজের মাত্রা অধিক হলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই পোল্ট্রির খাদ্যে সঠিক মাত্রায় খণিজপদার্থ সরবরাহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাচ্চা মুরগির খাদ্যে কী অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দরকার?

i) ২.২ ঃ ১
ii) ৩.২ ঃ ১
iii) ৪ ঃ ১
iv) ৩ ঃ ২

খ. কোন্ খণিজপদার্থের অভাবে "একজুডেটিভ ডায়াথেসিস" রোগ হয়?

i) ক্যালসিয়াম
ii) ম্যাঙ্গানিজ
iii) জিঙ্ক
iv) সেলিনিয়াম

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সোডিয়ামের অভাবে এক মুরগি অন্য মুরগিকে ঠোকরায়।
খ. জিঙ্কের অভাবে পেরোসিস রোগ হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ অভাবে অস্থি রাবারের মতো হয়।
খ. প্রতি টন মুরগির খাদ্যে _____ গ্রাম জিঙ্ক সরবরাহ করলে অভাব হয় না।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. সেলিনিয়াম কোন্ এনজাইমের অংশ?
খ. কোন্ খণিজপদার্থের অভাবে পাখির পায়ের চামড়া উঠে যায়?

পাঠ ৫.৩ ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষক্রিয়াজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির দেহে ছত্রাক স্নারা সৃষ্ট রোগ ও আক্রান্তকারী জীবাণুর নাম বলতে পারবেন।
- অ্যাসপারজিলোসিস রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাইকোটক্সিকোসিস রোগের কারণ, সংক্রমণ পদ্ধতি, লক্ষণ, প্রতিরোধ প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন।

খাদ্য পানি বা লিটারের সাথে ছত্রাকের জীবাণু বা বিষ পাখির দেহে প্রবেশ করলে ছত্রাকজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

ছত্রাক এককোষি জীবাণু, যেমন– ঈস্ট (Yeast) অথবা বহুকোষি, যেমন– মোল্ড (Mould), যা পাখির দেহের বাইরে জন্মায় এবং স্পোরের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। এরা টক্সিন বা বিষ তৈরি করে। খাদ্য অথবা পানি বা লিটারের সাথে ছত্রাকের জীবাণু বা বিষ প্রবেশ করলে পাখির দেহে রোগের সৃষ্টি হয়। সারণি ১ এ পোল্ট্রির দেহে ছত্রাক স্নারা সৃষ্ট রোগ ও জীবাণুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকজনিত রোগ ও জীবাণুর নাম

রোগের নাম	রোগের জীবাণু
অ্যাসপারজিলোসিস (Aspergillosis)	*Aspergillus fumigatus (অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস)* নামক মোল্ড স্নারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।
থ্রাস (Thrush)	*Candida albicans (ক্যানডিডা অ্যালবিকানস)* নামক ঈস্ট স্নারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।
ফেভাস (Favus)	*Trichophyton megnini (ট্রাইকোফাইটোন মেগনিনি)* নামক ছত্রাক স্নারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।
ডেকটাইলেরিওসিস (Dactylariosis)	*Dactylaria gallopava (ডেকটাইলেরিয়া গ্যালোপাভা)* নামক ছত্রাক স্নারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

পোল্ট্রির ছত্রাক স্নারা সৃষ্ট রোগসমূহের মধ্যে অ্যাসপারজিলোসিস সবচেয়ে বেশি মারাত্নক।

অ্যাসপারজিলোসিস (Aspergillosis)

Aspergillus fumigatus জীবাণু বাচ্চা মুরগিতে ব্রুডার নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে।

অ্যাসপারজিলোসিস পোল্ট্রির ছত্রাকজনিত রোগ। বয়স্ক মুরগির চেয়ে অল্প বয়সের মুরগি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। হাঁসের জন্য অ্যাসপারজিলাসের টক্সিন খুবই মারাত্নক। এ রোগের জীবাণু মূলত পাখির শ্বসনতন্ত্রকে আক্রান্ত করে এবং নিউমোনিয়া ঘটায়। ব্রুডারে বাচ্চা পালন অবস্থায় এ রোগ বেশি হয়। যেহেতু ব্রুডারে পালন অবস্থায় বাচ্চার নিউমোনিয়া হয়, এজন্য এ রোগকে ব্রুডার নিউমোনিয়াও (Brooder Pneumonia) বলা হয়।

কারণ

Aspergillus fumigatus (অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস) নামক ছত্রাক স্নারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

সংক্রমণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। যথা–

- মুরগির ঘরের আবর্জনা, লিটার, খাদ্য, পানির পাত্র, খাদ্যের পাত্র ইত্যাদির মধ্যে ছত্রাক জন্মায়। অনুকূল পরিবেশে ছত্রাক স্পোর সৃষ্টি করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ছত্রাকের স্পোর মুরগির দেহে প্রবেশ করে।
- ছত্রাক স্নারা কলুষিত খাদ্য, পানি, লিটার প্রভৃতি খেলে মুরগির মধ্যে এ রোগ দেখা দেয়।
- হ্যাচারির মধ্যে ছত্রাক জন্মালে ছত্রাকের স্পোর ডিমের ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢুকে এবং ভ্রূণের মৃত্যু ঘটায়।
- কলুষিত হ্যাচারির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বাচ্চার মধ্যে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

ব্রুডার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চার চোখ ফুলে যায়।

আক্রান্ত পাখিতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন–

- হ্যাচারির মাধ্যমে বাচ্চার মধ্যে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হলে ২–৩ দিনের বাচ্চায় এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। আক্রান্ত বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং হা করে ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয়।
- বাচ্চা পালন এলাকায় এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হলে আক্রান্ত বাচ্চা খাদ্য ও পানি পান করা বন্ধ করে দেয়। শেষের দিকে পাতলা পায়খানা করে।
- চোখের পাতা এবং চোখ ফুলে যায়। চোখের ভিতর হলুদ বর্ণের আঠালো তরল পদার্থ অথবা পনিরের মতো পদার্থ জমা হয়। ফলে পাখির চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- ওজন কমে যায় এবং আস্তে আস্তে পাখি মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা–

- ব্রুডারের বাচ্চায় শ্বাসতন্ত্রের লক্ষণ দেখে।
- খাদ্য ও লিটারে ছত্রাকের উপস্থিতি দেখে।
- ময়না তদন্তে প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে। এতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। যেমন–
  - ফুসফুস ও বায়ুথলিতে হলুদ, সবুজ বা নীল রঙের নডিউল দেখা যায়।
  - উদর, বক্ষগহ্বর, যকৃত ও মস্তিষ্কে নডিউল থাকতে পারে।
  - ফুসফুসে রক্তাধিক্য, পান্ডু বা কিছুটা ধূসর রঙের দাগ ও ফেনাযুক্ত নিঃস্রাব থাকতে পারে।

চিত্র ৫৭ ঃ অ্যাসপারজিলোসিস রোগে আক্রান্ত পাখির ফুসফুসে রক্তাধিক্য ও নডিউল

চিকিৎসা

তুতে অ্যাসপারজিলোসিস রোগে ভালো কাজ করে।

নিম্নলিখিতভাবে আক্রান্ত পাখির চিকিৎসা করা যায়। যথা–

- ০.৫ গ্রাম তুঁতে (Copper Sulphate) ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫–৭ দিন পান করালে এ রোগ ভালো হয়।
- ১ গ্রাম তুঁতে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাখির লিটারে স্প্রে করতে হবে।

প্রতিরোধ

নিম্নলিখিতভাবে আক্রান্ত পাখিতে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা–

- হ্যাচারি, মুরগির ঘর এবং তার আশপাশ সবসময় জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুনাশক হিসেবে সুপারসেপ্ট, হ্যালামিড, আয়োসান, প্রনটেক ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লিটারে যাতে খাদ্য এবং পানি না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- মুরগির ঘর, ব্রুডার হাউজ, খাদ্য, লিটার ইত্যাদি যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা উচিত।
- খাদ্যে মোল্ড ইনহিবিটর (Mould Inhibitor) হিসেবে সোডিয়াম প্রোপিওনেট (Sodium Propionate) ব্যবহার করলে এ রোগ হয় না।

মাইকোটক্সিকোসিস (Mycotoxicosis)

ছত্রাকের টক্সিন দ্বারা সৃষ্ট রোগকে মাইকোটক্সিকোসিস বলা হয়।

ছত্রাক যে টক্সিন (বিষ) সৃষ্টি করে তাকে মাইকোটক্সিন (Mycotoxin) বলে। আর মাইকোটক্সিন দ্বারা সৃষ্ট রোগই হচ্ছে মাইকোটক্সিকোসিস। পৃথিবীর প্রায় পোল্ট্রি পালন এলাকাতে এ রোগ দেখা যায়। সব ধরনের পোল্ট্রি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মুরগির চেয়ে হাঁস বেশি সংবেদনশীল। তবে বয়স্ক মুরগির চেয়ে বাড়ন্ত মুরগি এ রোগের জন্য বেশি সংবেদনশীল।

কারণ

অনেক ধরনের ছত্রাক টক্সিন তৈরি করে। নিম্নে হাঁসমুরগির জন্য কয়েকটি ক্ষতিকর টক্সিনের নাম উল্লেখ করা হলো–

বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের বিষের মধ্যে আফলাটক্সিন, ওকরাটক্সিন, টি$_২$ টক্সিন ও এফ$_{১২}$ টক্সিন গুরুত্বপূর্ণ।

(i) *Aspergillus flavus (অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস)*– এটি সাধারণত ১৪টি টক্সিন তৈরি করে। এর মধ্যে বি$_১$ সবচেয়ে বিষাক্ত। এটি হাঁসমুরগি ও টার্কিতে রোগ সৃষ্টি করে। *A. flavus* দ্বারা সৃষ্ট বিষের নাম আফলাটক্সিন (Aflatoxin)|

(ii) *Aspergillus ochracens* (*অ্যাসপারজিলাস ওকরাসিনস*)– এটি ওকরাটক্সিন এ এবং বি নামক টক্সিন সৃষ্টি করে যা মুরগির জন্য খুবই ক্ষতিকর।

(iii) *Fusarium tricinctum* (*ফিউসারিয়াম ট্রাইসিঙ্কটাম*)– এ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট টক্সিন ২ ট্রাইকোথিসেন্স বা টি$_২$ টক্সিন (T_2 Toxin) মুরগি, টার্কি, হাঁস ও কোয়েলে রোগ সৃষ্টি করে।

(iv) *Fusarium roseum (ফিউসারিয়াম রোজিয়াম)*– এ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট টক্সিনের নাম জিয়ারলেনোন বা এফ$_{১২}$ টক্সিন (F_{12} Toxin) যা মুরগি ও টার্কিতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সংক্রমণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিতভাবে এসব ছত্রাক পাখিকে আক্রমণ করে। যথা–

- খাদ্যের আর্দ্রতা বেশি হলে এবং খাদ্য পানিতে ভিজলে উপরোল্লেখিত ছত্রাক খাদ্যের মধ্যে জন্মায় এবং টক্সিন সৃষ্টি করে। এ ধরনের খাদ্য খেলে পাখির দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
- খাদ্য অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে ছত্রাকের টক্সিন তৈরি হয়। এজাতীয় খাদ্য খাওয়ালে পাখি বিষক্রিয়াজনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

আফলাটক্সিনের কারণে ডিমের খোসা পাতলা, আঁকাবাকা ও খসখসে হয়।

বিভিন্ন ধরনের বিষের কারণে পাখির দেহে বিভিন্ন রকমের উপসর্গ দেখা দেয়। যথা–

আফলাটক্সিন দ্বারা সৃষ্ট উপসর্গ–

- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- খাদ্য কম খায়।

- ডিমের খোসা পাতলা, আঁকাবাকা ও খসখসে হয় ।
- ডিমের খোসায় রক্তের ছিটা দেখা যায় ।
- হঠাৎ বাচ্চা মারা যায় ।

ওকরাটক্সিনের কারণে দেহের বিভিন্ন স্থানে ইউরেট জমা হয় ।

ওকরাটক্সিন স্নারা সৃষ্ট উপসর্গ–

- খাদ্য গ্রহণ একেবারেই কমে যায় ।
- পাতলা পায়খানা হয় ।
- মুরগি একেবারেই শুকিয়ে যায় ।
- দেহের বিভিন্ন স্থানে ইউরেট (Urates) জমা হয় ।

টি$_২$ টক্সিনের কারণে মুখের ভিতর, উপর ও নিচের ঠোঁট এবং জিহ্বায় ক্ষতের সৃষ্টি

টি$_২$ টক্সিন স্নারা সৃষ্ট উপসর্গ–

- চামড়া ফুলে যায় ও চুলকায় ।
- মুখের ভিতর, উপর ও নিচের ঠোঁট এবং জিহ্বায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় ।
- দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে ।

এফ$_{১২}$ টক্সিন স্নারা আক্রান্ত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাখির মৃত্যু ঘটে ।

এফ$_{১২}$ টক্সিন স্নারা সৃষ্ট উপসর্গ–

- ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত পাখির মৃত্যু ঘটে ।
- পেট ফুলে যায় ।
- দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না ।
- পালক কম গজায় ।

চিকিৎসা

এর কোনো চিকিৎসা নেই ।

প্রতিরোধ

প্রতিরোধের জন্য–

- বাসি, পচা ও স্যাঁতস্যাঁতে খাদ্য পাখিকে খাওয়ানো উচিত নয় ।
- বেশিদিনের সংরক্ষণ করা খাদ্য খাওয়ানো যাবে না ।
- খাদ্যে মোল্ড ইনহিবিটর, যেমন– সোডিয়াম প্রোপিওনেট ১% মাত্রায় ব্যবহার করলে এ রোগ হয় না ।
- উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

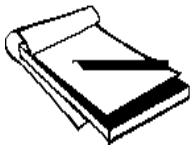

অনুশীলন (Activity) *ঃ পাখির দেহে ছত্রাক স্নারা সৃষ্ট রোগ ও তাদের জীবাণুর নাম লিখুন ।*

সারমর্ম ঃ ছত্রাক এককোষি অথবা বহুকোষি জীবাণু । ছত্রাক টক্সিন বা বিষ তৈরি করে । ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষ পাখির দেহে রোগ সৃষ্টি করে । ছত্রাকের মধ্যে *Aspergillus fumigatus* পোল্ট্রির জন্য খুবই মারাত্মক । এর আক্রমণে বাচ্চার ব্রুডার নিউমোনিয়া রোগ হয় । এছাড়াও পোল্ট্রির দেহে অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাকের বিষ বা টক্সিনের কারণে মাইকোটক্সিকোসিস রোগের সৃষ্টি হয় । এসব টক্সিনের নাম মাইকোটক্সিন । পোল্ট্রির জন্য ক্ষতিকর মাইকোটক্সিনগুলোর মধ্যে আফলাটক্সিন, ওকরাটক্সিন, টি$_২$ টক্সিন এবং এফ$_{১২}$ টক্সিন উল্লেখযোগ্য । এসব রোগের কারণে পাখিতে নানা ধরনের উপসর্গের সৃষ্টি হয় । অ্যাসপারজিলোসিসের চিকিৎসা থাকলেও মাইকোটক্সিকোসিসের কোনো চিকিৎসা নেই । তবে, খাদ্যের মধ্যে মোল্ড ইনহিবিটর মিশালে ছত্রাক ও ছত্রাকের বিষক্রিয়াজনিত রোগ রোধ করা সম্ভব ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ছত্রাকের বিষকে কী বলে?

i) আফলাটক্সিন
ii) ওকরাটক্সিন
iii) টি ২ টক্সিন
iv) মাইকোটক্সিন

খ. ঈস্ট কোন্ ধরনের জীবাণু?

i) বহুকোষি ছত্রাক
ii) ব্যাকটেরিয়া
iii) এককোষি ছত্রাক
iv) মাইকোপ্লাজমা

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. *Aspergillus flavus* স্নারা সৃষ্ট টক্সিনের নাম আফলাটক্সিন।

খ. ছত্রাক লার্ভার সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. থ্রাস *Candida* _____ স্নারা সৃষ্ট রোগ।

খ. মোল্ড ইনহিবিটর হিসেবে সোডিয়াম _____ খাদ্যে ব্যবহার করা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. অ্যাসপারজিলোসিস রোগকে কী বলা হয়?

খ. কোন্ ছত্রাক টি$_2$ টক্সিন তৈরি করে?

পাঠ ৫.৪ মুরগির ক্যানিবালিজম ও ডিম আটকে যাওয়া

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ক্যানিবালিজম বা ঠোকরাঠুকরির কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুরগির ঠোঁট কাটানোর নিয়ম বলতে পারবেন।
- মুরগির ডিম আটকে যাওয়ার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ঠোকরাঠুকরি বা ক্যানিবালিজম (Cannibalism)

মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির মধ্যে ঠোকরাঠুকরির স্বভাব রয়েছে। কিন্তু, এ স্বভাব যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় তখন তা বদঅভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে সুস্থ মুরগি দুর্বল মুরগিকে ঠোকর দিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলে, ঠোকর দিয়ে পালক তুলে নেয়, ঠুকরিয়ে পায়ুপথ নষ্ট করে দেয়।

মুরগি ও অন্যান্য পাখির ঠোকরাঠুকরির স্বভাব স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে তা বদঅভ্যাসে পরিণত হয়।

কারণ

বিভিন্ন কারণে পাখিতে ক্যানিবালিজম হতে পারে। যেমন—

- জায়গা অনুপাতে মুরগির সংখ্যা বেশি হলে।
- বাচ্চা পালন ঘরে তাপমাত্রা অতিরিক্ত হলে।
- খাদ্যে খণিজপদার্থের পরিমাণ কম হলে।
- বাতাসের আর্দ্রতা কম হলে।
- অতিরিক্ত আলোর প্রভাবে।
- মুরগির সংখ্যার চেয়ে মোরগের সংখ্যা বেশি হলে।
- খাদ্যের পাত্র কম হলে।
- খাদ্য সরবরাহ কম হলে।

ক্যানিবালিজমের প্রভাব

ক্যানিবালিজমের ফলে এক মুরগি অন্য মুরগির পালক তুলে ফেলে, ডিম ভেঙ্গে খেয়ে ফেলে ও মাংস ঠুকরিয়ে রক্তপাত ঘটায়।

একবার এটি শুরু হলে পুরো খামারে অল্প সময়ের মধ্যেই মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মুরগি ও অন্যান্য পাখির নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে। যথা—

- এক মুরগি অন্য মুরগির পালক তুলে ফেলে।
- ডিম ভেঙ্গে ফেলে এবং খেয়ে ফেলে।
- মাংস ঠুকরিয়ে রক্তপাত ঘটায়।
- রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
- আক্রান্ত মুরগি মারা যায়।

প্রতিরোধ ও দমন

এ বদঅভ্যাসজনিত রোগটি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যথা—

- কারণ উদ্‌ঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খাদ্যের মধ্যে পরিমাণমতো লবণ সরবরাহ করা।
- ৬—১০ দিন বয়সের বাচ্চার ঠোঁট কাটানো উচিত।

ঠোঁট কাটানোর পদ্ধতি

৬–১০ দিন বয়স হচ্ছে ঠোঁট কাটানোর সবচেয়ে উত্তম সময়।

যে কোনো বয়সে ঠোঁট কাটানো যায়। তবে, সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে ৬—১০ দিন বয়স। ঠোঁট কাটানোর যন্ত্র বা ডিবিকারের (Debeaker) সাহায্যে মুরগির ঠোঁট কাটতে হয়। এ পদ্ধতির জন্য

ঠোঁট কাটানোর জন্য বৈদ্যুতিক ডিবিকারের ব্লেডকে ৮১৫° সে. তাপমাত্রায় গরম করতে হয়।

বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে যন্ত্রটির ব্লেডকে ৮১৫° সে. তাপমাত্রায় গরম করে নিতে হয় অর্থাৎ ব্লেড যখন একেবারে লাল টকটকে হবে তখনই বুঝতে হবে ব্লেড তৈরি। তারপর দুই ব্লেডের মাঝে মুরগির ঠোঁট রেখে পা দিয়ে মেশিনটি চাপ দিলে ঠোঁট কাটা হয়ে যায়। নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের চেয়ে কম কাটতে হয়। উপরের ঠোঁট নাসারন্ধ্রের ২ মি.মি. সামনে পর্যন্ত কাটতে হবে।

অনুশীলন (Activity) *ঃ মুরগির ঠোঁট কীভাবে কাটতে হয় তা লিখুন।*

ডিম পাড়ার সময় অনেক মুরগির ডিম ডিম্বনালিতে আটকে যায়।

ডিম আটকে যাওয়া

ডিম পাড়ার সময় অনেক মুরগির ডিম ডিম্বনালিতে আটকে যায়, বাইরে বের হতে পারে না। এটি অনেক সময়ই অধিক উৎপাদনশীল মুরগিতে ঘাটতে দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে এমন হতে পারে।

কারণ

নিম্নে মুরগির ডিম আটকে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করা হলো—

- ডিমের আকার অনেক বড় হলে।
- ডিমের খোসা খসখসে হলে।
- ডিম পাড়ার সময় এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয় যা ডিমকে বাইরে বের হতে সাহায্য করে। এ পিচ্ছিল পদার্থের নিঃসরণ কম হলে বা না হলে।
- ডিম্বাশয়ে প্রদাহ বা অন্য কোনো রোগ হলে।
- ডিমপাড়া মুরগির অত্যধিক চর্বি হলে।
- ডিম পাড়ার সময় মুরগিকে বিরক্ত করলে।

লক্ষণ

ডিম আটকে গেলে মুরগি সবসময় ছটফট করে, ঘনঘন কোথ দেয়।

এতে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যথা—

- মুরগি সবসময় ছটফট করে।
- ডিম পাড়ার স্থানে বার বার যায় কিন্তু ডিম না পেড়ে চলে আসে।
- ঘনঘন কোথ দেয়।
- পায়ুপথ দিয়ে রক্ত বের হতে পারে।
- মারা যায়।

চিকিৎসা

আঙ্গুলের সাহায্যে ভেসিলিনজাতীয় পদার্থ মলদ্বারের ভিতর দিয়ে ডিম্বানালির চারপাশে লাগালে তা পিচ্ছিল হয়, ফলে ডিম বের হয়ে আসে।

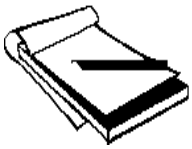

অনুশীলন (Activity) *ঃ ডিম আটকে যাওয়ার কারণগুলো খাতায় লিখুন।*

সারমর্ম ঃ ক্যানিবালিজম বদঅভ্যাস এবং খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ। এর ফলে এক মুরগি অন্য মুরগির শরীরে রক্তপাত ঘটায়। ফলে মুরগি মারা যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবেও এ রোগ দেখা যায়। কারণ উদঘাটন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে, মুরগির বাচ্চার বয়স যখন ৬—১০ দিন হবে, তখন সঠিকভাবে ঠোঁট কাটলে এ সমস্যা দেখা দেয় না। বিভিন্ন করণে ডিমপাড়া মুরগির ডিম পেটে আটকে যায়। লক্ষণ দেখে মলদ্বারের চারপাশে ভেসিলিনজাতীয় পদার্থ লাগালে এ সমস্যার সমাধান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ক্যানিবালিজমের কারণ কী?

i) ভিটামিনের অভাব
ii) প্রোটিনের অভাব
iii) খণিজ লবণের অভাব
iv) চর্বিজাতীয় খাদ্যের অভাব

খ. ঠোঁট কাটানোর প্রকৃত বয়স কখন?

i) ২–৩ দিন
ii) ৫–৬ দিন
iii) ৬–৭ দিন
iv) ৬–১০ দিন

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির ঠোকরাঠুকরিকে ক্যানিবালিজম বলে।
খ. ক্যানিবালিজম কখনোই মহামারী আকারে দেখা যায় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ প্রদাহ হলে মুরগির ডিম আটকে যেতে পারে।
খ. আটকে যাওয়া ডিম পাড়ার জন্য মুরগি কোথ দিলে _____ দিয়ে রক্ত বের হতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কীসের সাহায্যে মুরগির ঠোঁট কাটতে হয়?
খ. ডিম আটকে গেলে মলদ্বারের চারপাশে কী লাগাতে হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৫ আক্রান্ত একটি মুরগি দেখে ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো শণাক্ত করা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুরগির দেহে ভিটমিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো শণাক্ত করতে পারবেন।
- ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

পোল্ট্রির চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং প্রজননের জন্য ভিটামিন এ একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পোল্ট্রির চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং প্রজননের জন্য ভিটামিন এ একান্ত জরুরি। খাদ্যে ভিটামিন এ এর সরবরাহ কম হলে পাখির দেহে ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়। ভিটামিন এ এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো ভালোভাবে জানার জন্য এ কোর্সবইয়ের পাঠ ৫.১ ভালোভাবে পড়ুন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ভিটামিন এ এর অভাবজনিত একটি মুরগি।
২. মুরগি রাখার খাঁচা।
৩. নির্দেশকারী যে কোনো একটি কাঠি (মাথা চোখা নায় এমন)
৪. অ্যান্টিসেপটিক সলুশন (স্যাভলন অথবা পটাশের পানি)
৫. জীবাণুনাশক (আয়োসান অথবা সুপারসেপ্ট ২%)

কাজের ধারা

- ২% আয়োসান অথবা সুপারসেপ্ট দিয়ে মুরগির খাঁচা ভালোভাবে স্প্রে করুন।
- স্যাভলন বা পটাশের পানি দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন, যাতে হাতে লেগে থাকা জীবাণু আক্রান্ত মুরগিতে সংক্রমিত না হয়।
- আক্রান্ত মুরগিকে খাঁচায় রাখুন।
- এবার নির্দেশকারী কাঠির সাহয্যে উপসর্গগুলো নির্দেশ করুন ও খাতায় লিখুন। যেসব উপসর্গগুলো আক্রান্ত মুরগিতে দেখা যেতে পারে তা হলো–

চিত্র ৫৮ ঃ ভিটামিন এ এর অভাবে মুরগির মুখগহ্বরে হাইপারক্যারাটোসিস (সাদা দাগগুলো)

- ♦ চোখের পাতা ফুলে যাওয়া ।
- ♦ চোখের মধ্যে আঠার মতো তরল পদার্থ পাওয়া ।
- ♦ চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া ।
- ♦ মাথার ঝুঁটি ও গলার ফুল ফ্যাকাসে এবং শুষ্ক হয়ে যাওয়া ।
- ♦ পালক উসকোখুশকো হয়ে যাওয়া ।
- ♦ বেশি দিনের আক্রান্ত মুরগির চোখের কর্নিয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া ।

- সরবরাহকৃত মুরগিতে আপনার দেখা পর্যবেক্ষণ নোট করুন ।
- এবার আপনার দেখা লক্ষণগুলো পাঠ ৫.১ ও এখানে দেয়া লক্ষণগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে মিলিয়ে নিন ।
- অতঃপর লক্ষণ অনুযায়ী মুরগিতে ভিটামিন এ এর অভাব নিশ্চিতভাবে শণাক্ত করুন ।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও মূল্যায়নের জন্য টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন ।

সুবিধা

চাক্ষুষভাবে উপসর্গগুলো দেখে ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ শণাক্ত করা যায় ।

অসুবিধা

একই সময় আক্রান্ত মুরগিটি অন্য রোগে আক্রান্ত হলে, অন্য রোগের উপসর্গগুলোর সাথে এলোমেলো হতে পারে ।

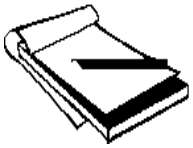

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভিটামিনের অভাবে পোল্ট্রিতে কী কী রোগ হয়?
২। খণিজপদার্থের অভাবে মুরগিতে কী কী রোগ হয়?
৩। ভিটামিন ডি এর অভাবে পাখিতে কী কী রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়?
৪। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে পাখিদেহে কী কী রোগ হয়?
৫। সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্লোরিনের অভাবে মুরগির দেহে কী ঘটে?
৬। পাখিদেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব কীভাবে পূরণ করা যায়? সেলিনিয়ামের অভাবে কী রোগ হতে পারে?
৭। জীবাণুর নামসহ ছত্রাক স্নারা পাখির দেহে সৃষ্ট রোগগুলোর নাম লিখুন।
৮। ব্রুডার নিউমোনিয়া কাকে বলে? কীভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়?
৯। মাইকোটক্সিকোসিস কী? তিনটি ছত্রাকের নাম উল্লেখপূর্বক এদের স্নারা সৃষ্ট টক্সিনের নাম লিখুন?
১০। ক্যানিবালিজম কী? মুরগির ক্যানিবালিজমের কারণ কী?

উত্তরমালা – ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। ক. i ১। খ. i ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. রিকেট ৩। খ. ৫০০–৮০০
৪। ক. ভিটামিন কে ৪। খ. কার্লড-টো-প্যারালাইসিস

পাঠ ৫.২

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. ফসফরাসের ৩। খ. ১৫–৩০
৪। ক. গ্লুটাথায়ন পারোক্সিডেজ ৪। খ. জিঙ্কের অভাবে

পাঠ ৫.৩

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. *albicans* ৩। খ. প্রোপিওনেট ৪। ক. ব্রুডার নিউমোনিয়া ৪। খ. *Fusarium tricinctum*

পাঠ ৫.৪

১। ক. iii ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. ডিম্বাশয়ে ৩। খ. পায়ুপথ
৪। ক. ডিবিকার ৪। খ. ভেসলিন

ইউনিট ৬
পোল্ট্রির
রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

ইউনিট ৬ পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Prevention is Better Than Cure অর্থাৎ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। ভবিষ্যতের রোগের কথা চিন্তা করে আগাম ব্যবস্থা হলো প্রতিরোধ। তাই পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানের পাশাপাশি খামার ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া দরকার। এখন পর্যন্ত পোল্ট্রির প্রতিটি রোগের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা সম্ভব হয় নি। টিকা প্রয়োগের ফলে পোল্ট্রির দেহে নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। যেহেতু প্রতিটি রোগের টিকা পাওয়া যায় না, সেহেতু বিভিন্ন সময় পোল্ট্রিতে অনেক রোগ দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন রোগে প্রতিবছর বহুসংখ্যক পোল্ট্রি মারা যায়। অবশ্য বর্তমানে পোল্ট্রির অনেক রোগের চিকিৎসার জন্য বহু কার্যকরী ওষুধ তৈরি হয়েছে। রোগ দেখা দেয়ার পর এসব ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ দমন করা খুবই সহজ। এক কথায়, পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধ ও দমনের জন্য টিকা, সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, বিজ্ঞানভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কার্যকরী ওষুধের একান্ত প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পোল্ট্রির টিকাবীজ সংরক্ষণ ও পরিবহণ, টিকার পরিচিতি, টিকা প্রয়োগ, টিকা প্রদান সিডিউল প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণ ও পরিবহণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- টিকা কী তা বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রির বিভিন্ন টিকাবীজের নাম ও সংরক্ষণ তাপমাত্রা লিখতে পারবেন।
- টিকাবীজ সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- টিকাবীজ পরিবহণের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

টিকাবীজ হচ্ছে রোগের প্রতিষেধক যা জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়।

টিকাবীজ (Vaccine)

টিকাবীজ হচ্ছে রোগের প্রতিষেধক, যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক (Antigenic) উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) নামক আমিষজাতীয় পদার্থ তৈরি হয়, যাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বলা হয়। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগপ্রতিরোধক পদার্থ।

যে রোগের জীবাণু দিয়ে টিকাবীজ তৈরি করা হয় টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে সে রোগের বিরুদ্ধেই দেহের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। সাধারণত জীবাণুকে জীবিত রেখে বা মেরে ফেলে বা নিষ্ক্রিয় করে টিকাবীজ তৈরি করা হয়। তৈরিকৃত টিকাবীজ তরল এবং ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়।

টিকাবীজ সংরক্ষণ

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে হয়।

টিকাবীজ তৈরির পর এদের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা–

- প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, অবশ্যই রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অতিরিক্ত অথবা অতি অল্প তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করলে টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- টিকাবীজ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়সীমা থাকে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই টিকাবীজ ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ যতই যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হোক না কেন, এর গুণাগুণ নির্দিষ্ট সময় সীমার পর কোনোক্রমেই থাকে না। তাই মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- শুষ্ক হিমায়িত ট্যাবলেট আকারের টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে কোনো টিকাবীজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। সাধারণত একটি টিকাবীজ এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। এ সময়ের পর গুলানো টিকাবীজ কখনোই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে না। তাই ব্যবহারের পর টিকার অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করা যাবে না। সারণি ২ এ পোল্ট্রিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন টিকাবীজের সংরক্ষণ তাপমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে।

শুষ্ক হিমায়িত ট্যাবলেট আকারের টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

সারণি ২ ঃ পোল্ট্রিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন টিকাবীজের সংরক্ষণ তাপমাত্রা

টিকাবীজের নাম	সংরক্ষণ তাপমাত্রা
বি.সি.আর.ডি.ভি., আর.ডি.ভি., ফাউল পক্স ও ডাক প্লেগ	০° সে.
গামবোরো, মারেক'স, সালমোনেলা ও মাইকোপ্লাজমা	২–৮° সে.
ফাউল কলেরা	৪° সে.

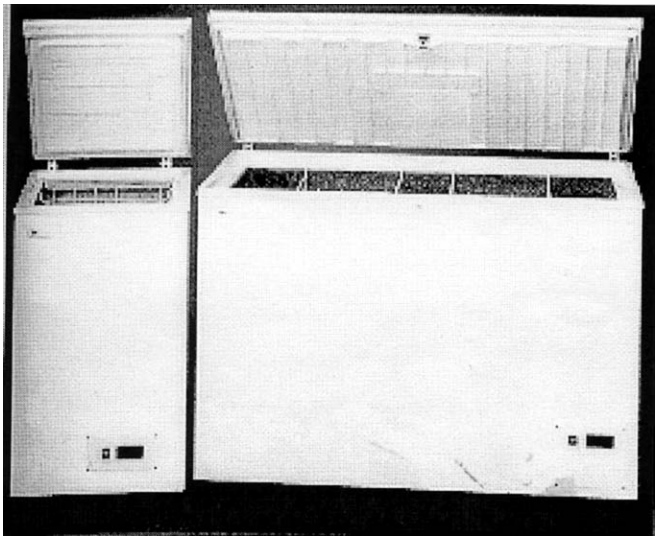

চিত্র ৫৯ ঃ রেফ্রিজারেটরে নির্ধারিত তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ

টিকাবীজের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণ

অনেক সময় সংরক্ষণের পরেও টিকাবীজের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এখানে এর কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো–

অনেক সময় সংরক্ষণের পরেও টিকাবীজের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

- অসুস্থ পোল্ট্রিকে টিকা প্রয়োগ করলে।
- টিকা প্রয়োগের যন্ত্রপাতি কোনো রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিষ্কার করলে।
- পোল্ট্রির দেহে কৃমির আক্রমণ থাকলে।
- অতি অল্প মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করলে।
- টিকাবীজ খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে।

- বয়সের সাথে সম্পৃক্ত না রেখে টিকাবীজ প্রয়োগ করলে।
- পোল্ট্রির দেহে বিপাকীয় ক্রিয়ার ত্রুটি ঘটলে।
- টিকা ব্যবহারের যন্ত্রপাতির গায়ে জীবাণু লেগে থাকলে।
- টিকাবীজের গায়ে রোদ লাগলে।
- গুলানো টিকাবীজ একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করলে।

টিকাবীজ পরিবহণ

টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়।

টিকাবীজ একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহণ করতে হয়। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

- টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া যায়। তবে, বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।
- বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালোভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (Cool Room) রেখে স্থানান্তর করা হয়।
- খুব কম সময়ের জন্য টিকাবীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

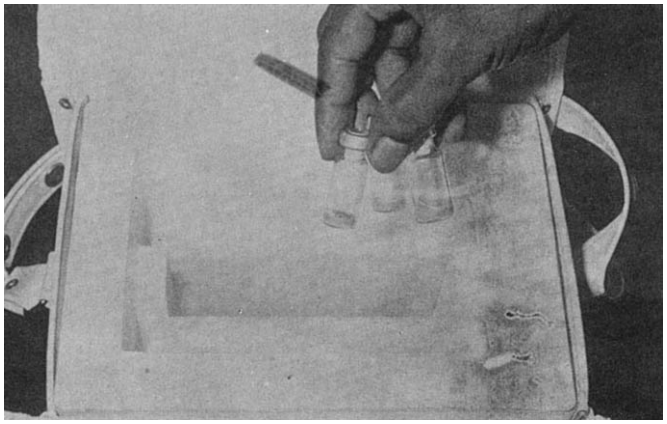

চিত্র ৬০ ঃ বিশেষ ধরনের থার্মোফ্লাক্সে টিকা পরিবহণ

অনুশীলন (Activity) *ঃ টিকাবীজ সংরক্ষণের পরেও তার কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণগুলো খাতায় লিখুন।*

সারমর্ম ঃ টিকাবীজ রোগের প্রতিষেধক, যা রোগের জীবাণু দিয়ে তৈরি করা হয়। টিকাবীজের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। ব্যবহারের পর টিকাবীজের অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে প্রয়োগ করা যায় না। এতে টিকার গুণাগুণ একেবারেই কমে যায়। টিকাবীজ একস্থান হতে অন্যস্থানে সরবরাহ নেয়ার সময় অবশ্যই থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে নিতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানীর ক্ষেত্রে টিকাবীজ শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালোভাবে প্যাকিং করে স্থানান্তর করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মাইকোপ্লাজমা টিকাবীজ কত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়?

i) ৮° সে.
ii) ৪° সে.
iii) ২° সে.
iv) ২°–৮° সে.

খ. অ্যান্টিবডি কোথায় থাকে?

i) দেহকোষে
ii) লিম্ফ রসে
iii) রক্ত ও রক্ত রসে
iv) যকৃতে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পোল্ট্রি অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই টিকা দিয়ে নিতে হয়।
খ. টিকাবীজ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে হয়।
খ. গুলানোর পর টিকাবীজ _____ মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. জীবাণুকে কী করে টিকাবীজ তৈরী করা হয়?
খ. শুষ্ক হিমায়িত টিকাবীজ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়?

পাঠ ৬.২ ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকাগুলোর নাম লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকাবীজের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লজমা জীবাণু থেকে প্রস্তুত এবং শুধু ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা-জনিত রোগের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত টিকাগুলোই যথাক্রমে ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লজমাল টিকা।

ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকা

যেসব টিকাবীজ ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয় এবং যেগুলো শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই ব্যাকটেরিয়াল টিকাবীজ (Bacterial Vaccine)। আর যেগুলো মাইকোপ্লাজমা জীবাণু থেকে তৈরি করা হয় ও শুধু মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মাইকোপ্লাজমাল টিকাবীজ (Mycoplasmal Vaccine) বলে। ব্যাকটেরিয়া বা মাইকোপ্লাজমাকে জীবিত রেখে অথবা মেরে ফেলে অথবা নিষ্ক্রিয় করে এসব টিকাবীজ তৈরি করা হয়। ট্যাবলেট আকারে এবং তরল অবস্থায় এসব টিকাবীজ পাওয়া যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে হাঁসমুরগিতে যেসব ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকাবীজ ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সালমোনেলা টিকাবীজ

মুরগিতে যাতে ফাউল টাইফয়েড রোগ না হয় সেজন্য এ টিকা দিতে হয়। ফাউল টাইফয়েড হচ্ছে *Salmonella gallinarum (সালমোনেলা গ্যালিনেরাম)* নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক ধরনের সংক্রামক রোগ। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য লাইভ (যেমন– নবিলিস এসজি ৯ আর) ও ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকাবীজ রয়েছে।

সালমোনেলা লাইভ টিকাবীজ ব্যাকটেরিয়ার ৯ আর স্ট্রেইন থেকে তৈরি করা হয়।

সালমোনেলা লাইভ টিকাবীজ

নবিলিস এসজি ৯ আর টিকাবীজ (Nobilis SG 9 R Vaccine) হচ্ছে সালমোনেলা লাইভ টিকাবীজ। এ টিকাবীজ *Salmonella gallinarum* ব্যাকটেরিয়ার ৯ আর (9R) স্ট্রেইন থেকে তৈরি করা হয়। এটি জীবিত (Live) টিকাবীজ।

ব্যবহার ক্ষেত্র

ফাউল টাইফয়েড রোগপ্রতিরোধের জন্য সব ধরনের সুস্থ মুরগিতে এ টিকা দিতে হয়।

চেনার উপায়

টিকার গায়ে নাম লেখা থাকে। টিকাবীজ ট্যাবলেট আকারে সরবরাহ করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রতি ছোট শিশি বা ভায়াল (Vial) টিকাবীজ প্রতি বোতল ডাইলুয়েন্টের (Diluent) সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পাখা অথবা ঘাড়ের চামড়ার নিচে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জের সাহায্যে ইনজেকশন দিতে হয়।

চিত্র ৬১ ঃ নবিলিসি এসজি ৯ আর টিকা

মাত্রা

প্রতি মুরগিকে ০.২ মি.লি. করে প্রদান করতে হবে।

টিকাদান কর্মসূচি

৬ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডোজ এবং ১৬ সপ্তাহ বয়সে দ্বিতীয় ডোজ প্রয়োগ করতে হবে।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
২–৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ টিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

সরবরাহ
প্রতি ভায়ালে ৫০০ মাত্রার টিকাবীজ থাকে। সঙ্গে ১০০ মি.লি. ডাইলুয়েন্ট সরবরাহ করা হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
ইন্টারভেট ইন্টারন্যাশনাল বি.ভি., বক্সমিয়ার, নেদারল্যান্ডস (Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands)|

বাংলাদেশে প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল ওভারসিজ লিমিটেড।

ফাউল কলেরা টিকাবীজ
ফাউল কলেরা টিকাবীজ *Pasteurella multocida* ব্যাকটেরিয়ার টাইপ এ মেরে তৈরি করা হয়।

হাসঁমুরগির কলেরা রোগপ্রতিরোধের জন্য ফাউল কলেরা টিকাবীজ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের টিকা রয়েছে। তন্মধ্যে এখানে দুটো উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাউল কলেরা মৃত টিকাবীজ
এ টিকাবীজ *Pasteurella multocida (পাসচুরেলা মালটোসিডা)* নামক ব্যাকটেরিয়ার টাইপ এ মেরে তৈরি করা হয়।

ব্যবহার ক্ষেত্র
ফাউল কলেরা রোগপ্রতিরোধের জন্য সুস্থ হাঁসমুরগিতে এ টিকা দেয়া হয়।

চেনার উপায়
১০০ মি.লি. বোতলে তরল অবস্থায় এ টিকাবীজ পাওয়া যায় এবং বোতলের গায়ে নাম লেখা থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা
বোতলটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে ১ মি.লি. করে মুরগির ক্ষেত্রে পাখার চামড়ার নিচে এবং হাঁসের ক্ষেত্রে বুকের চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

টিকা প্রয়োগের বয়স
মুরগির ক্ষেত্রে ৭৫ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ৯০ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ এবং এরপর থেকে ৬ মাস পরপর প্রয়োগ করতে হয়। হাঁসের ক্ষেত্রে ৬০ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ৭৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ এবং এরপর থেকে ৬ মাস পরপর প্রয়োগ করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
৪° সে. এ সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণাগার, মহাখালী, ঢাকা এবং পশুপালন গবেষণাগার, কুমিল্লা।

নবিলিস এফ সি ইন্যাক টিকাবীজ

এ নিষ্ক্রিয় টিকাটি *Pasteurella multocida* জীবাণুর সেরোটাইপ ১, ৩, ৪ ও ৫ কে নিষ্ক্রিয় করে তৈরি করা হয়।

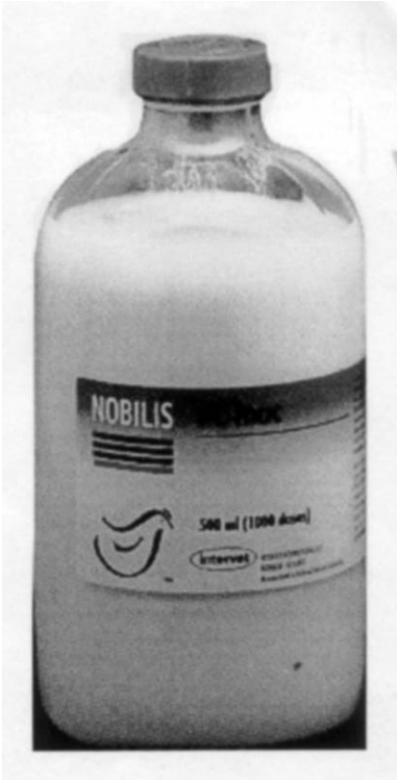

চিত্র ৬২ ঃ নবিলিসি এফ সি ইন্যাক টিকা

ব্যবহার ক্ষেত্র

ফাউল কলেরা রোগপ্রতিরোধের জন্য সুস্থ হাঁসমুরগিতে এ টিকা দেয়া হয়।

চেনার উপায়

৫০০ মি.লি. বোতলে তরল অবস্থায় এ টিকাবীজ পাওয়া যায় এবং বোতলের গায়ে নাম লেখা থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা

০.৫ মি.লি. মাত্রায় প্রতিটি মুরগি ও হাঁসকে ঘাড়ের পিছনের চামড়ার নিচে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়।

টিকা প্রয়োগের বয়স

৮ সপ্তাহ বয়সে প্রথমবার ও ১৬ সপ্তাহ বয়সে বুস্টার হিসেবে দিতে হবে।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

ইন্টারভেট ইন্টারন্যাশনাল বি.ভি., বক্সমিয়ার, নেদারল্যান্ডস (Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands)।

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল ওভারসিজ লিমিটেড।

Mycoplasma gallisepticum নামক জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে মাইকোপ্লাজমা টিকাবীজ তৈরি করা হয়।

মাইকোপ্লাজমা টিকাবীজ

মাইকোপ্লাজমোসিস একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী টিকাবীজের নাম "মাইকোপ্লাজমা টিকা"। বিভিন্ন টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নামে এ টিকাবীজ উৎপন্ন করে। যেমন– নবিলিস এমজি ৬/৮৫।

নবিলিস এমজি ৬/৮৫

Mycoplasma gallisepticum (মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম) নামক জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে এ টিকাবীজ তৈরি করা হয়।

ব্যবহার ক্ষেত্র

মুরগির মাইকোপ্লজমোসিস রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

টিকা চেনার উপায়

৫০০ মি.লি. বোতলে টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় যা ১০০০টি মুরগিকে প্রয়োগ করা যায়। বোতলের গায়ে টিকার নাম লেখা থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা

বোতলটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে মুরগির ঘাড়ের পিছনে চামড়ার নিচে ০.৫ মি.লি. করে ইনজেকশন দিতে হয়।

টিকা প্রয়োগের বয়স

৬ সপ্তাহ বয়সে প্রথমবার ও এর ৩–৪ সপ্তাহ পর অর্থাৎ ৯–১০ সপ্তাহ বয়সে পুনরায় মুরগিকে এ টিকা প্রদান করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা

২–৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands.

চিত্র ৬৩ ঃ নবিলিস এমজি ৬/৮৫ টিকাবীজ

সরবরাহকারী

বেঙ্গল ওভারসিজ লিমিটেড।

অনুশীলন (Activity) *ঃ হাঁসমুরগির ব্যাকটেরিয়াল ও মাইকোপ্লাজমাল টিকাবীজগুলোর নাম এবং প্রয়োগপদ্ধতি ও মাত্রা ছক আকারে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ ব্যাকটেরিয়াল টিকাবীজ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে এবং মাইকোপ্লজমাল টিকাবীজ মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমাদের দেশে বর্তমানে সালমোনেলা, ফাউল কলেরা, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতি টিকাবীজগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মধ্যে ফাউল কলেরা হাঁস ও মুরগি উভয়কে প্রয়োগ করা হয়। অন্য দুটো টিকাবীজ শুধু মুরগির জন্য। সালমোনেলা টিকাবীজ শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় থাকে যা ০.২ মি.লি. মাত্রায় ৬ এবং ১৬ সপ্তাহ বয়সে প্রয়োগ করতে হয়। ফাউল কলেরা ও মাইকোপ্লাজমা টিকা তরল অবস্থায় থাকে। এ দুটো টিকাবীজ নির্দিষ্ট বয়সে যথাক্রমে ১ মি.লি. ও ০.৫ মি.লি. মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ফাউল কলেরা টিকা হাঁসের কোথায় প্রয়োগ করতে হয়?

i) বুকের চামড়ার নিচে
ii) রানের মাংসে
iii) ঘাড়ের চামড়ার নিচে
iv) ডানার চামড়ার নিচে

খ. মাইকোপ্লাজমা টিকা প্রথমবার কত বয়সে দেয়া হয়?

i) ৪ সপ্তাহ
ii) ৬ সপ্তাহ
iii) ৮ সপ্তাহ
iv) ১০ সপ্তাহ

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. নবিলিস এমজি ৯ আর একটি জীবিত টিকা।
খ. সালমোনেলা টিকাবীজের সঙ্গে ডাইলুয়েন্ট থাকে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ফাউল টাইফয়েড রোগের টিকা দিতে হয় _____ বয়সে।
খ. ফাউল কলেরা টিকাবীজ _____ *multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ফাউল টাইফয়েডের নিষ্ক্রিয় টিকার নাম কী?
খ. মাইকোপ্লজমা টিকা কীভাবে তৈরি হয়?

পাঠ ৬.৩ ভাইরাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির ভাইরাল টিকাগুলোর নাম লিখতে পারবেন।
- পোল্ট্রির বিভিন্ন ভাইরাল টিকাগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি, সংরক্ষণ, ব্যবহার ক্ষেত্র, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভাইরাল টিকা

যেসব টিকাবীজ ভাইরাস থেকে প্রস্তুত করা হয় এবং যেগুলো শুধু ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে সেগুলোকে ভাইরাল টিকা (Viral Vaccine) বলে। এসব টিকাবীজ জীবাণুকে জীবিত রেখে অথবা মেরে ফেলে অথবা নিষ্ক্রিয় করে তৈরি করা হয়। এজাতীয় টিকাবীজগুলো খুবই কার্যকরী, যা প্রয়োগের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগ না হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া যায়।

ভাইরাস থেকে প্রস্তুত এবং ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকাগুলোই ভাইরাল টিকা।

বাংলাদেশে বর্তমানে হাঁসমুরগির যেসব ভাইরাল টিকা পাওয়া যায় এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বি.সি.আর.ডি.ভি. (Baby Chick Ranikhet Disease Vaccine)

বি.সি.আর.ডি.ভি. নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাসের ল্যানটোজেনিক মুকতেশ্বর স্ট্রেইনের জীবন্ত টিকা।

এটি মুরগির বাচ্চার রাণীক্ষেত রোগের টিকাবীজ। এটি নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাসের ল্যানটোজেনিক (Lantogenic) মুকতেশ্বর স্ট্রেইনের জীবন্ত টিকাবীজ যা শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ছোট কাচের ভায়ালে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ক্ষেত্র

মুরগির বাচ্চার রাণীক্ষেত রোগপ্রতিরোধের জন্য এ টিকা দিতে হয়।

টিকা চেনার উপায়

সবুজ বর্ণের ট্যাবলেট আকারে এ টিকা সরবরাহ করা হয়।

চিত্র ৬৪ ঃ বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি ভায়াল টিকাবীজ ৬ মি.লি. পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে মুরগির বাচ্চার এক চোখে এক ফোটা করে দিতে হয়।

টিকাদান কর্মসূচি
৭ দিন বয়সে ১ম ডোজ এবং ২১ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
এ টিকা ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণাগার, মহাখালী, ঢাকা।

আর.ডি.ভি. নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাসের মেসোজেনিক মুকতেশ্বর স্ট্রেইনের জীবন্ত টিকাবীজ যা শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ছোট কাঁচের ভায়ালে পাওয়া যায়।

আর.ডি.ভি. (Ranikhet Disease Vaccine)
এটি বড় মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকা। এটি নিউক্যাসল ডিজিজ ভাইরাসের (Newcastle Disease Virus) মেসোজেনিক (Mesogenic) মুকতেশ্বর স্ট্রেইনের জীবন্ত (Live) টিকাবীজ যা শুষ্ক হিমায়িত (Freez Dried) অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ক্ষেত্র
বড় মুরগির রাণীক্ষেত রোগপ্রতিরোধের জন্য প্রয়োগ করতে হয়।

টিকা চেনার উপায়
এ টিকা সাদা রঙের ট্যাবলেট আকারে সরবরাহ করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি ভায়াল টিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিস্রুত পানি বা ডিস্টিলড ওয়াটারের (Distilled Water) সাথে মিশিয়ে ১ মি.লি. করে রানের মাংসে ইনজেকশন দিতে হয়।

টিকাদান কর্মসূচি
৬০ দিন বয়সে প্রথম ডোজ এবং এরপর থেকে ৬ মাস পরপর এ টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
এ টিকা ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণাগার, মহাখালী, ঢাকা।

গামবোরো জীবন্ত টিকাবীজ ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইন দ্বারা তৈরি।

গামবোরো জীবন্ত টিকাবীজ (Gumboro Live Vaccine)
এটি জীবিত টিকাবীজ, যা ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজের (Infectious Bursal Disease) বিভিন্ন স্ট্রেইন দ্বারা তৈরি। এটি কাঁচের ছোট ভায়ালে শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাজারে বিভিন্ন টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নামের টিকাবীজ রয়েছে। যেমন– Nobilis Gumboro D 78, VI Bursa G, Bur 706, Gumboral CT ইত্যাদি।

ব্যবহার ক্ষেত্র

মুরগির বাচ্চার গামবোরো রোগপ্রতিরোধের জন্য এ টিকা দিতে হয় ।

টিকা চেনার উপায়

টিকার ভায়ালের গায়ে এ টিকার নাম লেখা থাকে ।

প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো মিশিয়ে চোখে ফোটা দিতে হয় অথবা মুখে এক ফোটা করে পান করানো যায় ।

চিত্র ৬৫ ঃ নবিলিস গামবোরো ডি ৭৮ টিকাবীজ

টিকাদান কর্মসূচি

সাধারণত ১৪–১৮ দিন বয়সে ১ম ডোজ এবং ২৪–২৮ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করতে হয় । তবে, বিভিন্ন টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকমের টিকাদান কর্মসূচি দিয়ে থাকেন ।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা

এ টিকাগুলো ২–৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় ।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

ক. D 78 Vaccine t Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands.
খ. VI BURSA G t Bremer Pharma, Germany.
গ. BUR 706, Gumboral C.T. t Rhone-Poulenc, France.

সরবরাহকারী

ক. D 78 Vaccine t বেঙ্গল ওভারসিজ লিমিটেড ।
খ. VI BURSA G t আরিফ'স বাংলাদেশ লিমিটেড ।
গ. BUR 706, Gumboral C.T. t রোন-পোলেন্ক এগ্রোভেট বাংলাদেশ লিমিটেড ।

গামবোরো নিষ্ক্রিয় টিকা ইনফেকশাস বারসাল ভিজিজ ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে তৈরি করা হয় ।

গামবোরো নিষ্ক্রিয় টিকাবীজ (Gumboro Inactivated Vaccine)

ইনফেকশাস বারসাল ভিজিজ ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে এ টিকাবীজ তৈরি করা হয় । এটি সাধারণত ৫০০ মি.লি. বোতলে তরল আবস্থায় পাওয়া যায় ।

ব্যবহার ক্ষেত্র

মুরগির প্যারেন্ট স্টকের প্রজননের জন্য যেসব মোরগমুরগি রাখা হয় সেগুলোকে এ টিকা প্রদান করতে হয় । প্রজননের জন্য মোরগমুরগিকে এ টিকা দিলে নির্দিষ্ট বয়সের বাচ্চার (১৮ দিন পর্যন্ত) গামবোরো রোগ হয় না ।

টিকা চেনার উপায়
বোতলের গায়ে এ টিকার নাম লেখা থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি মুরগিকে ০.৫ মি.লি. করে চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

টিকা প্রদানের বয়স
ডিমপাড়া শুরুর ৩ সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৮–২০ সপ্তাহের মুরগিকে এ টিকা প্রদান করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
এ টিকা ২–৮$^{\circ}$ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
বিশ্বের বিভিন্ন ওষুধ ও টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এ টিকা প্রস্তুত করে থাকে। যেমন–
Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands.

ফাউল পক্স টিকা ফাউল পক্স ডিজিজ ভাইরাসের বিউটেট স্ট্রেইনকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়।

ফাউল পক্স টিকা (Fowl Pox Vaccine)
এটি ফাউল পক্স ডিজিজ ভাইরাসের বিউটেট স্ট্রেইনকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়, যা শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ক্ষেত্র
মুরগির বসন্ত রোগপ্রতিরোধের জন্য এ টিকা দিতে হয়।

টিকা চেনার উপায়
কাঁচের ভায়ালে লালচে রঙের ট্যাবলেট আকারে সরবরাহ করা হয়।

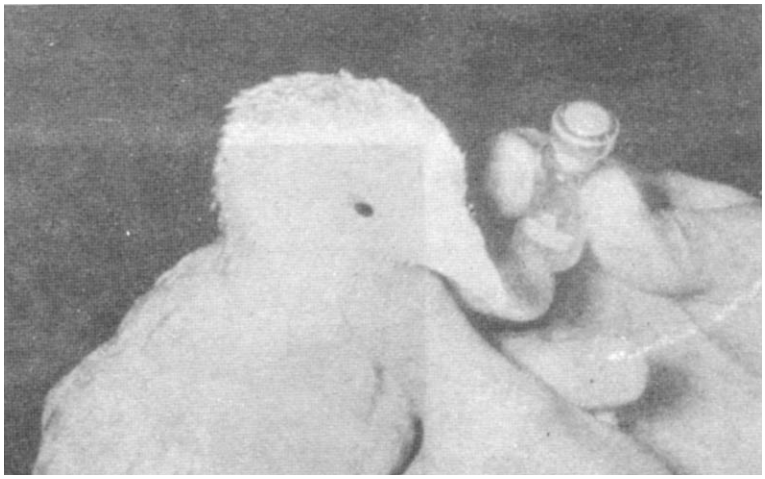

চিত্র ৬৬ ঃ ফাউল পক্স রোগের টিকাবীজ

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি ভায়াল টিকাবীজ ৩ মি.লি. পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে পাখির ডানার ত্রিকোণাকৃতির মাংসপেশির মধ্যে খোঁচা মেরে প্রয়োগ করতে হয়।

চিত্র ৬৭ ঃ টিকার ভায়ালে ৩ মি.লি. পরিস্রুত পানি দিতে হয়

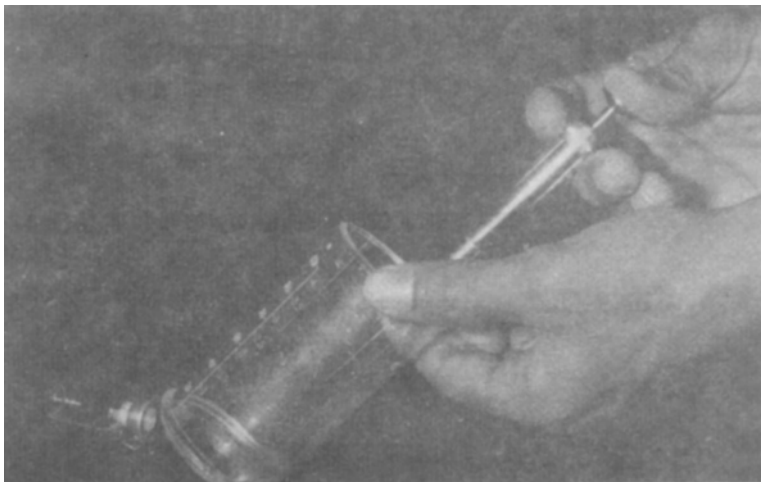

চিত্র ৬৮ ঃ সবটুকু টিকাই বিকারে রাখতে হয়

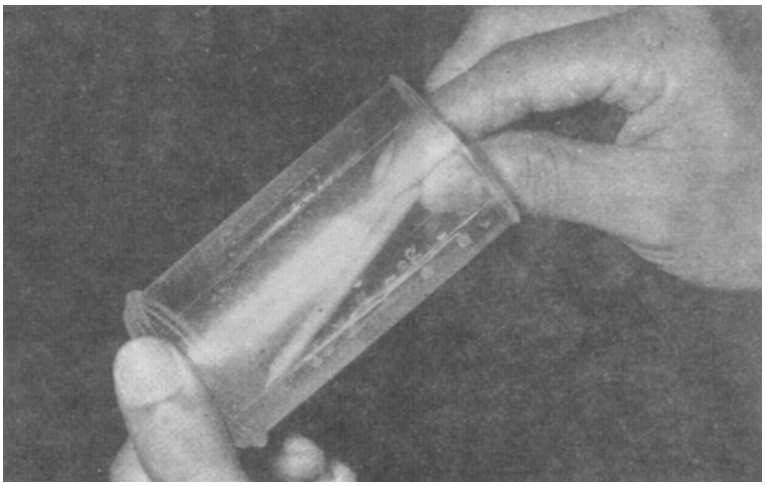

চিত্র ৬৯ ঃ উইং পাঞ্চার টিকার মধ্যে ডুবিয়ে টিকা প্রয়োগ করা হয়

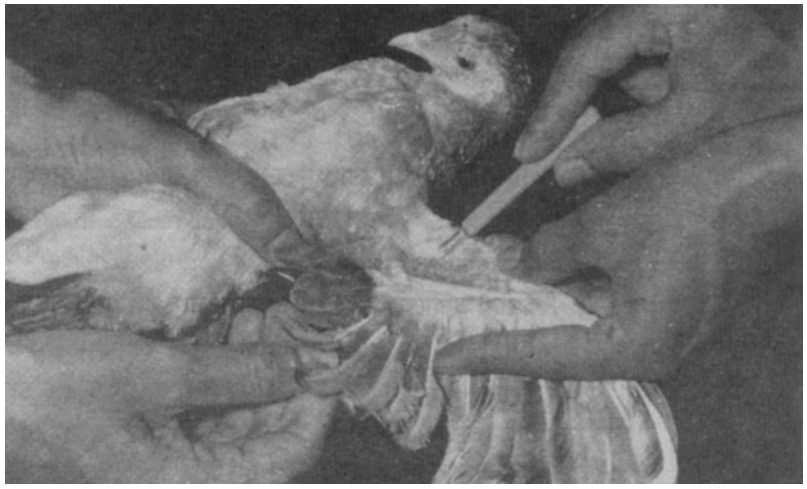

চিত্র ৭০ ঃ পাখির ডানার এ ত্রিকোণাকৃতি স্থানে সুই বিদ্ধ করা হয়

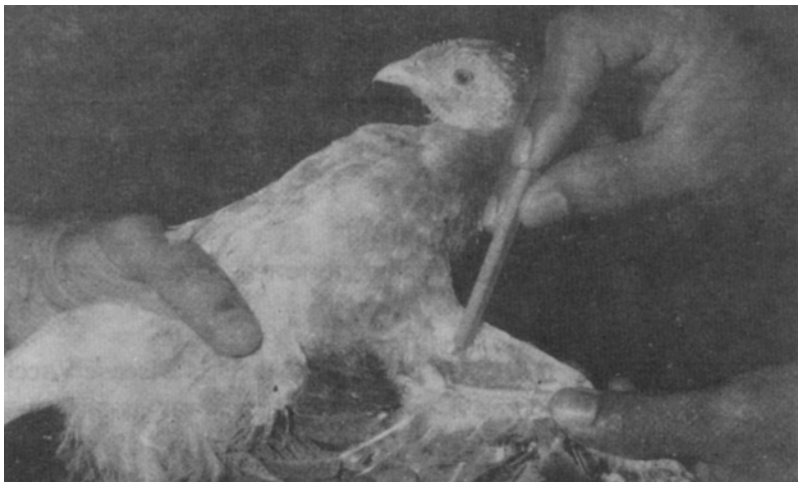

চিত্র ৭১ ঃ এভাবে খুঁচিয়ে সুই বিদ্ধ করা হয়

টিকা প্রদানের বয়স

৩০ দিন বয়সে ১ম ডোজ এবং ৬ মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হয় ।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা

এ টিকা ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় ।

সরবরাহ

প্রতি ভায়ালে ২০০টি বাচ্চাকে দেয়ার উপযোগী টিকা থাকে ।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণাগার, মহাখালী, ঢাকা ।

ডাক প্লেগ টিকা হাঁসের ডাক প্লেগ ভাইরাসকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়।

ডাক প্লেগ টিকা
এটি হাঁসের ডাক প্লেগ ভাইরাসকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়, যা শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ক্ষেত্র
হাঁসের ডাক প্লেগ রোগপ্রতিরোধের জন্য এ টিকা ব্যবহার করা হয়।

টিকা চেনার উপায়
কাঁচের ভায়ালের মুখে ছিপির মধ্যে নীল রঙ দেয়া থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রতি ভায়াল টিকাবীজ ১০০ মি.লি. পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ১ মি.লি. করে রানের মাংসে ইনজেকশন দিতে হয়।

টিকা প্রয়োগের বয়স
৩০ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ৪৫ দিন বয়সে বুস্টার ডোজ এবং ৬ মাস পরপর এ টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা
এ টিকা ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণাগার, মহাখালী, ঢাকা।

মারেক্সিন সিএ টিকা মুরগির বাচ্চার মারেক'স ভাইরাসের এ ১২৬ স্ট্রেইনকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়।

মারেক'স টিকা (Marek's Disease Vaccine)
মারেক'স রোগ প্রতিরোধের জন্য বহু ধরনের টিকা রয়েছে। যেমন– মারেক্সিন সিএ, রিসমাভেক নবিলিস, রিসমাভেক সিআর ৬ ইত্যাদি। এটি মুরগির বাচ্চার মারেক'স ভাইরাসের এ ১২৬ স্ট্রেইনকে জীবিত রেখে তৈরি করা হয়। শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে এ টিকা পাওয়া যায়।

ব্যবহার ক্ষেত্র
মারেক'স রোগপ্রতিরোধের জন্য এ টিকা ব্যবহার করা হয়।

চেনার উপায়
ভায়ালের গায়ে টিকার নাম লেখা থাকে।

প্রয়োগ পদ্ধতি
প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী ডাইলুয়েন্টের সঙ্গে মিশিয়ে ০.২ মি.লি. করে ঘাড়ের চামড়ার নিচে দিতে হয়।

টিকা প্রয়োগের বয়স
বাচ্চা মুরগির একদিন বয়সেই এ টিকা প্রদান করতে হয়।

সংরক্ষণ তাপমাত্রা

এ টিকা ২–৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় ।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো এ টিকা তৈরি করে থাকে । যথা–

K. Intervet International B.V., Boxmeer, the Netherlands.
L. Bremer Pharma, Germany.
M. Rhone-Poulenc, France.

অনুশীলন (Activity) *ঃ বিভিন্ন টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গামবোরো লাইভ টিকাবীজের নাম ও সংরক্ষণ তাপমাত্রা লিখুন ।*

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রির ভাইরাল টিকা ভাইরাস জীবিত রেখে অথবা মেরে ফেলে অথবা নিষ্ক্রিয় করে তৈরি করা হয় । জীবিত টিকাগুলো মূলত শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ট্যাবলেট আকারে কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায় । নিষ্ক্রিয় এবং মৃত ভাইরাল টিকাবীজগুলো তরল অবস্থায় তৈরি করা হয় । এসব টিকাবীজ নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে । ট্যাবলেট আকারের টিকাবীজগুলো পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয় । নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট রোগের টিকাবীজ প্রয়োগ করলে পোল্ট্রির দেহে ঐ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. মুরগির বাচ্চার রাণীক্ষেত রোগের টিকার নাম কী?

i) আর.ডি.ভি.
ii) ডি.পি.
iii) এফ.পি.
iv) বি.সি.আর.ডি.ভি.

খ. ফাউল পক্স টিকার প্রথম ডোজ কতদিন বয়সে দিতে হয়?

i) ৪০ দিন বয়সে
ii) ৬০ দিন বয়সে
iii) ৩০ দিন বয়সে
iv) ২০ দিন বয়সে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. আর.ডি.ভি. হচ্ছে বড় মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকাবীজ।

খ. সাদা ট্যাবলেট দেখে ডাক প্লেগ টিকা চিনতে হয়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক. প্রজননের মোরগমুরগিকে গামবোরো _____ টিকা দিতে হয়।

খ. বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ _____ মি.লি. পরিস্রুত পানির সাথে মিশাতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ কত দিন বয়সে প্রথম প্রয়োগ করতে হয়?

খ. গামবোরো লাইভ টিকাবীজের সংরক্ষণ তাপমাত্রা কত?

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪ বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণ করা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা যাচাই করতে পারবেন।
- নিজ হাতে বিভিন্ন ধরনের পোল্ট্রির টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে পারবেন।

টিকাবীজ একস্থান হতে অন্যস্থানে সরবরাহ নেয়ার সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে নিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মনে করুন, কোনো টিকাবীজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে হাঁসমুরগির বিভিন্ন টিকাবীজ সরবরাহ নেয়া হলো। এ টিকাগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। একটি কথা মনে রাখবেন, টিকাবীজ একস্থান হতে অন্যস্থানে সরবরাহ নেয়ার সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে নিতে হয়। অতএব, টিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য পাঠ ৬.১ ভালোভাবে পড়ুন।

টিকাবীজ সংরক্ষণ

টিকাবীজের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এগুলো সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণের মাধ্যমে টিকাবীজের মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। টিকা যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে ব্যবহারের সময়সীমা থাকলেও এ টিকা ব্যবহার করে কোনো লাভ হয় না। সারণি ৩ এ বিভিন্ন টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণ করার তাপমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৩ ঃ বিভিন্ন টিকাবীজের সংরক্ষণ তাপমাত্রা

টিকাবীজের নাম	সংরক্ষণ তাপমাত্রা
বি.সি.আর.ডি.ভি., আর.ডি.ভি., ফাউলপক্স, ডাক প্লেগ	০° সে.
সালমোনেলা, মারেক'স, গামবোরো, মাইকোপ্লাজমা	২–৮° সে.
ফাউল কলেরা	৪° সে.

সুবিধা

এভাবে অনেকদিন পর্যন্ত টিকাবীজ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা

বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে রেফ্রিজারেটর অনেকক্ষণ বন্ধ থাকলে টিকাবীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. পোল্ট্রির বিভিন্ন টিকাবীজ
২. রেফ্রিজারেটর
৩. থার্মোফ্লাক্স
৪. বরফ
৫. তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র (থার্মোমিটার)
৬. টিকাবীজ রাখার ট্রে
৭. জীবাণুনাশক, যেমন– স্যাভলন, ডেটল ইত্যাদি
৮. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে রেফ্রিজারেটরের কানেকশন ভালোভাবে দেখে নিন।
- তাপমাত্রামাপক একটি যন্ত্র রেফ্রিজারেটরের উপরের চেম্বারে এবং অন্যটি নিচের চেম্বারে কিছুক্ষণ রাখুন।
- এবার রেফ্রিজারেটরের দুই চেম্বারের তাপমাত্রা নোট করুন। সাধারণত প্রতিটি রেফ্রিজারেটরের উপরের চেম্বারের তাপমাত্রা ০° সে. এবং নিচের চেম্বারের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ঠান্ডায় (Maximum Cool) ৪–৬° সে. থাকে। এক্ষেত্রে নিচের চেম্বারের রেগুলেটর সর্বোচ্চ ঠান্ডায় রাখুন।
- এবার হাত ভালোভাবে জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে নিন।
- টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহকৃত টিকাবীজের থার্মোফ্লাক্সটি রেফ্রিজারেটরের কাছে আনুন।
- টিকাবীজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টিকাবীজ সংরক্ষণের নির্দেশাবলী সারণি ৩ থেকে জেনে নিন।
- এবার বি.সি.আর.ডি.ভি., আর.ডি.ভি., ফাউল পক্স, ডাক প্লেগ প্রভৃতি টিকাবীজগুলো ট্রেতে ভালোভাবে সাজিয়ে নিন এবং রেফ্রিজারেটরের উপরের চেম্বারে ট্রে রাখুন।
- সালমোনেলা, মারেক'স, গামবোরো, মাইকোপ্লাজমা ও ফাউল কলেরা টিকাবীজগুলো রেফ্রিজারেটরের নিচের চেম্বারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখুন।
- আস্তে করে রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করুন।
- রেফ্রিজারেটরের দুই চেম্বারে তাপমাত্রা মাপার দুটো যন্ত্র রাখুন এবং মাঝেমধ্যে তাপমাত্রা যাচাই করুন।
- রেফ্রিজারেটরের বৈদ্যুতিক কানেকশন ঠিক আছে কি–না মাঝেমধ্যে দেখুন।
- পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও তা মূল্যায়নের জন্য আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

পাঠ ৬.৫ নিজ হাতে মুরগি বা হাঁসকে কলেরার টিকা প্রদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কলেরা রোগের টিকাবীজ দেখে চিনতে পারবেন ।
- নিজ হাতে মুরগি বা হাঁসকে কলেরার টিকাদান করতে পারবেন ।

টিকা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই হাঁস বা মুরগিকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করা যায় ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

টিকা প্রদানের মাধ্যমে সহজেই হাঁস বা মুরগিকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করা যায় । এ ইউনিটের পাঠ ৬.২ এ কলেরার টিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে । পাঠ ৬.২ ভালোভাবে পড়ুন । এরপর পরীক্ষণটি সম্পন্ন করুন ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ৭৫ দিন বয়সের চেয়ে বড় মুরগি বা হাঁস
২. কলেরা রোগের টিকাবীজ
৩. ফুটন্ত গরম পানি
৪. জীবাণুনাশক (আয়োসান ২% অথবা সুপারসেপ্ট ২%)
৫. যন্ত্রপাতি–
   ক. সিরিঞ্জ
   খ. নিডল (সুচ)
   গ. মুরগি বা হাঁসের খাঁচা
   ঘ. থার্মোফ্লাক্স
৬. বরফের টুকরো
৭. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি ।

কাজের ধারা

- আয়োসান অথবা সুপারসেপ্ট ২% দিয়ে মুরগি বা হাঁসের খাঁচা ভালোভাবে স্প্রে করে নিন ।
- সিরিঞ্জ, থার্মোফ্লাক্স ইত্যাদি ভালোভাবে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন ।
- খাঁচায় টিকা প্রয়োগের উপযুক্ত বয়সের মুরগি বা হাঁস রাখুন ।

চিত্র ৭২ ঃ কলেরার টিকা দেয়ার উপযোগী ৭৫ দিন বয়সের মুরগি

- থার্মোফ্লাক্স ঠান্ডা হলে কিছু বরফের টুকরো থার্মোফ্লাক্সে নিন। তারপর মুরগি বা হাঁসের সংখ্যা অনুযায়ী ফাউল কলেরা টিকা থার্মোফ্লাক্সে নিয়ে ঢাকনা বন্ধ করুন। প্রতি ভায়াল ফাউল কলেরা টিকাবীজ ১০০টি হাঁস বা মুরগিকে দেয়া যায়।
- থার্মোফ্লাক্স থেকে টিকার বোতল বের করুন এবং ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।
- এবার সিরিঞ্জের সাহায্যে টিকা বের করুন। আস্তে আস্তে ১ মি.লি. করে প্রতিটি মুরগির পাখার চামড়ার নিচে ইনজেকশন করুন অথবা প্রতিটি হাঁসকে ১ মি.লি. করে বুকের চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিন।

চিত্র ৭৩ ঃ এভাবে পাখার চামড়ার নিচে কলেরা টিকা দেয়া হয়

- পুরো পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও মূল্যায়নের জন্য টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন।

সুবিধা

প্রতিটি হাঁস বা মুরগিকে সমান মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা যায়।

অসুবিধা

এতে সময় বেশি লাগে।

সাবধানতা

- টিকা প্রয়োগের সময় সিরিঞ্জে যাতে বাতাস না ঢুকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- এক ঘন্টার মধ্যে টিকা প্রয়োগের কাজ শেষ করা উচিত।

পাঠ ৬.৬ নিজ হাতে একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগিকে রাণীক্ষেতের টিকা প্রদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রাণীক্ষেত রোগের টিকাবীজ গুলতে পারবেন ।
- নিজ হাতে মুরগির একদিনের বাচ্চাকে রাণীক্ষেত রোগের টিকা দান করতে পারবেন ।

বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকাবীজের নাম বি.সি.আর.ডি.ভি. ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

রাণীক্ষেত হচ্ছে মুরগির মারাত্মক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । এর বিরুদ্ধে টিকা প্রয়োগ করা না হলে মড়ক আকারে মুরগিতে এ রোগ দেখা দেয় । বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত টিকাবীজের নাম বি.সি.আর.ডি.ভি. (Baby Chick Ranikhet Disease Vaccine)| এ রোগ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য পাঠ ৬.৩ ভালোভাবে পড়ুন ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একদিন বয়সের মুরগির বাচ্চা
২. যন্ত্রপাতি–
   ক. সিরিঞ্জ
   খ. নিডল (সুচ)
   গ. ড্রপার
   ঘ. চিক বক্স
   ঙ. মাপচোঙ
৩. বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ
৪. পরিস্রুত পানি
৫. ফুটন্ত গরম পানি
৬. জীবাণুনাশক (আয়োসান ২% অথবা সুপারসেপ্ট ২%)
৭. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি ।

চিত্র ৭৪ ঃ বি.সি.আর.ডি.ডি. টিকাবীজ

কাজের ধারা

- ২% আয়োসান অথবা সুপারসেপ্ট দিয়ে চিক বক্স ভালোভাবে স্প্রে করুন।
- ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে সিরিঞ্জ, নিডল, ড্রপার, মাপচোঙ এবং থার্মোফ্লাক্স ভালোভাবে চুবিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

চিত্র ৭৫ ঃ একদিন বয়সের মুরগির বাচ্চা

- কিছুক্ষণ পর চিক বক্স থেকে সব একদিনের বাচ্চা নিন।
- থার্মোফ্লাক্স একেবারে ঠান্ডা হলে কিছু বরফ থার্মোফ্লাক্সে নিয়ে বাচ্চার সংখ্যা অনুযায়ী বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ নিন এবং থার্মোফ্লাক্সের ঢাকনা বন্ধ করুন। খেয়াল রাখতে হবে এক ভায়াল বি.সি.আর.ডি.ভি. টিকাবীজ ১০০টি বাচ্চায় প্রয়োগ করা যায়।
- মাপচোঙের সাহায্যে পরিস্রুত পানি মেপে নিন। প্রতি ভায়াল টিকাবীজের জন্য পরিস্রুত পানির পরিমাপ ৬ মি.লি.।
- মাপচোঙে মাপা ৬ মি.লি. পানি থেকে ২ অথবা ৩ মি.লি. পানি সিরিঞ্জে ভরে নিন এবং সিরিঞ্জের সাহায্যে টিকাবীজের ভায়ালে প্রবেশ করান।
- ভালোভাবে ভায়ালটি ঝাঁকিয়ে নিন। তারপর সিরিঞ্জের সাহায্যে মিশ্রিত টিকাবীজ বের করে মাপাচোঙের বাকি পরিস্রুত পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
- এবার ড্রপারের মধ্যে মাপচোঙ থেকে মিশ্রিত টিকাবীজ ভরে নিন।
- তারপর বাম হাতে একটি একদিনের বাচ্চা নিন এবং চোখ উপরে রেখে বাচ্চাটিকে হাতের মধ্যে শোয়ানো অবস্থায় ধরুন। আঙ্গুলের সাহায্যে বাচ্চার মাথা এমনভাবে ধরবেন যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।

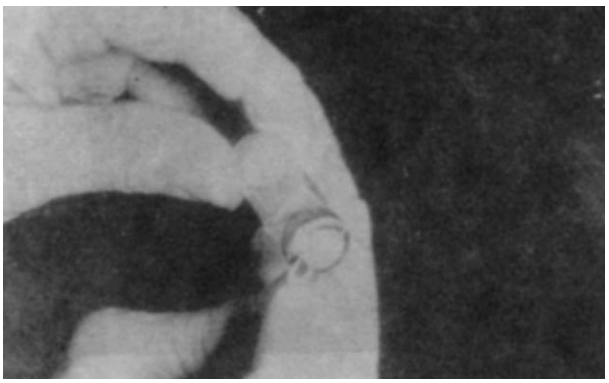

চিত্র ৭৬ ঃ এভাবে শিশির উপরের সিল করা ধাতব ঢাকনাটি খুলে ফেলুন

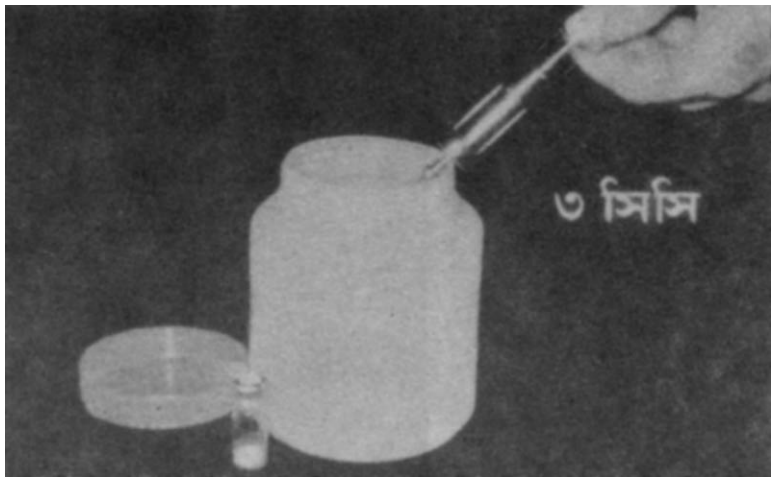

চিত্র ৭৭ ঃ সিরিঞ্জের মধ্যে ৩ মি.লি. পরিস্রুত পানি নিন

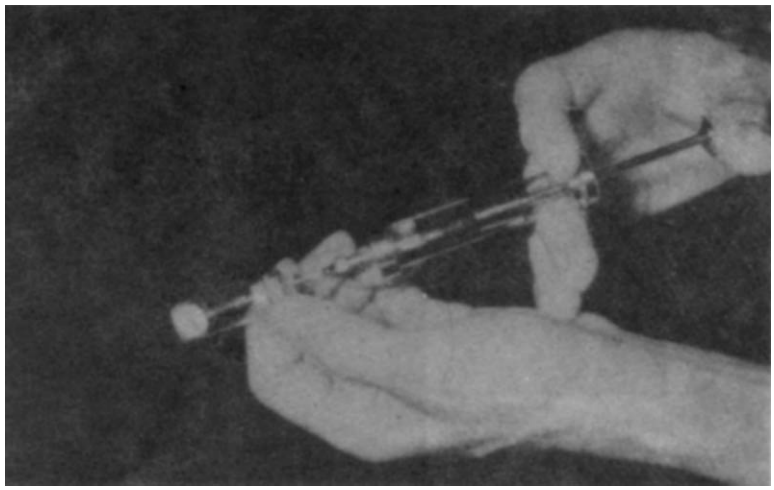

চিত্র ৭৮ ঃ সুচটি শিশির ঢাকনার মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করান

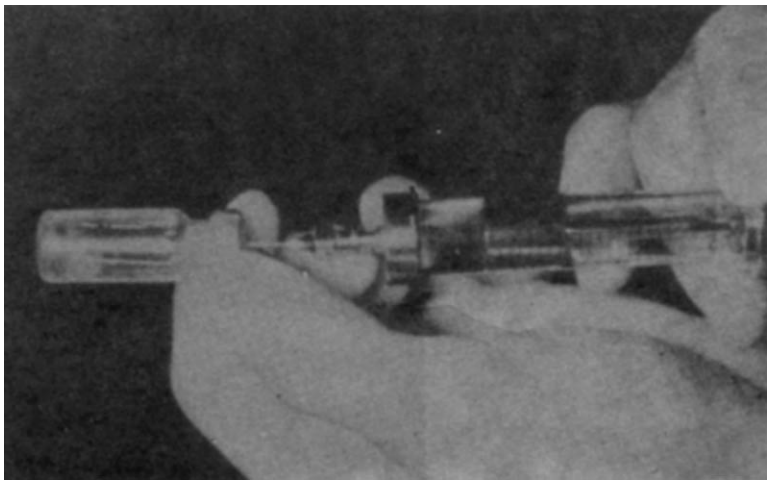

চিত্র ৭৯ ঃ ধীরে ধীরে পরিস্রুত পানি শিশির ভিতর এমনভাবে ঢুকান যাতে টিকা গলে যায়

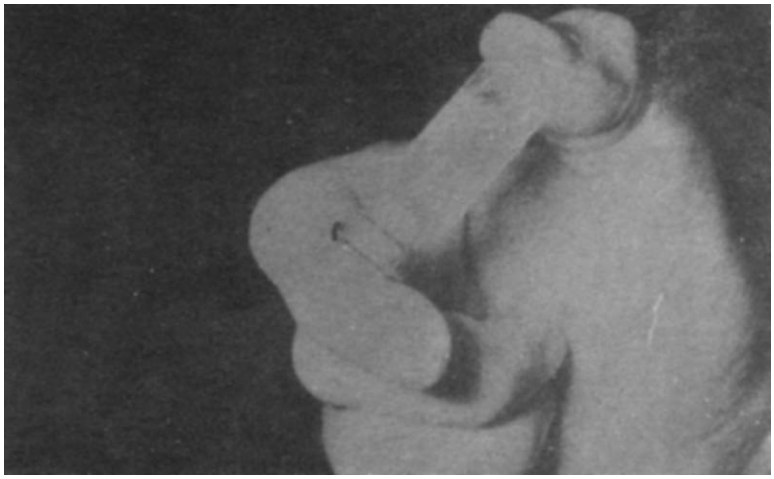

চিত্র ৮০ ঃ টিকা পুরোপুরি গলানোর জন্য শিশিটি আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন

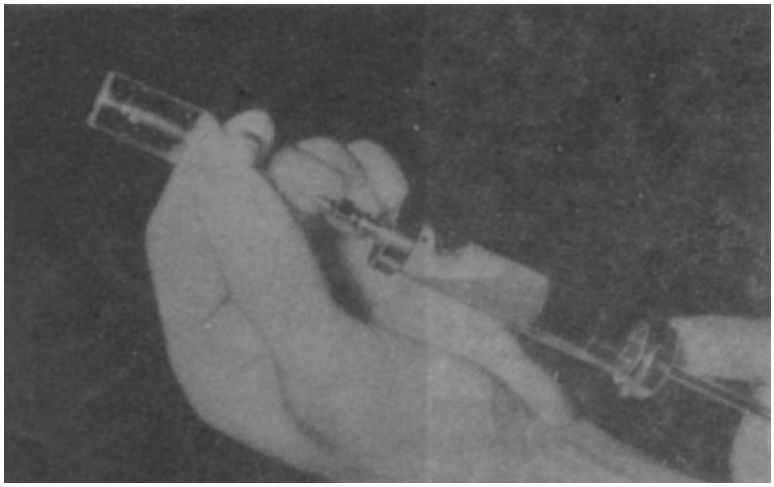

চিত্র ৮১ ঃ গলে যাওয়া সম্পূর্ণ টিকা সিরিঞ্জের ভিতরে নিয়ে নিন

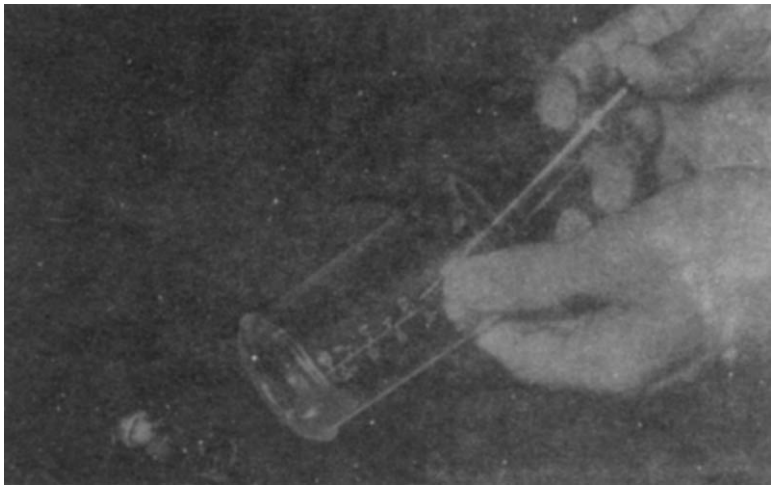

চিত্র ৮২ ঃ সিরিঞ্জ থেকে টিকা একটি পাত্রে রাখুন

চিত্র ৮৩ ঃ পাত্র থেকে এভাবে ড্রপারের সাহায্যে টিকা তুলুন

- ডান হাতে ড্রপার নিয়ে ড্রপারের সাহায্যে বাচ্চার চোখের মধ্যে ১ ফোটা টিকাবীজ দিন ।

চিত্র ৮৪ ঃ এভাবে ড্রপার থেকে বাচ্চার এক চোখে এক ফোটা টিকা দিন

- টিকাবীজ চোখে পড়ার পর বাচ্চা কোনো কিছু খাওয়ার মতো গিলে খেলে বা ঢোক গিললে মনে করতে হবে যে টিকাবীজ ভিতরে প্রবেশ করেছে ।
- কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন ।

সুবিধা

এতে প্রতিটি বাচ্চাকে সমান মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা যায় ।

অসুবিধা

এতে সময় বেশি লাগে ।

সাবধানতা

- এক ভায়াল টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ১ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হবে ।
- বেঁচে যাওয়া মিশ্রিত টিকা কখনোই সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে না ।

পাঠ ৬.৭ হাঁসকে নিজ হাতে ডাক প্লেগের টিকা প্রদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজ হাতে ডাক প্লেগ টিকাবীজ গুলতে পারবেন।
- নিজ হাতে হাঁসকে ডাক প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করতে পারবেন।

ডাক প্লেগ হাঁসের মারাত্নক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। নিয়মানুযায়ী টিকা দিলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ডাক প্লেগ হাঁসের মারাত্নক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগের টিকা প্রদান না করলে ডাক প্লেগ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। এ রোগের টিকাবীজের নাম "ডাক প্লেগ" টিকা। এ টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০০%। তাই এ টিকা নিয়মানুযায়ী দিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ৩০ দিনের বয়োসোর্ধ হাঁস
২. যন্ত্রপাতি–
   ক. সিরিঞ্জ
   খ. নিডল
   গ. থার্মোফ্লাক্স
   ঘ. মাপচোঙ
   ঙ. হাঁস রাখার খাঁচা
৩. ডাক প্লেগ টিকাবীজ
৪. পরিস্রুত পানি
৫. ফুটন্ত গরম পানি
৬. বরফের টুকরো
৭. জীবাণুনাশক হিসেবে আয়োসান ২% বা সুপারসেপ্ট ২%

কাজের ধারা

- প্রথমে ২% আয়োসান বা সুপারসেপ্ট খাঁচায় স্প্রে করে খাঁচা জীবাণুমুক্ত করুন।
- ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে সিরিঞ্জ, নিডল, মাপচোঙ এবং থার্মোফ্লাক্স ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
- টিকা প্রয়োগের উপযুক্ত সবগুলো হাঁস খাঁচায় রাখুন।
- থার্মোফ্লাক্স ঠান্ডা হলে কিছু বরফের টুকরো থার্মোফ্লাক্সে নিন। হাঁসের সংখ্যা অনুযায়ী ডাক প্লেগ টিকাবীজ থার্মোফ্লাক্সে নিয়ে থার্মোফ্লাক্সের ঢাকনা বন্ধ করুন। আমরা জানি, প্রতি ভায়াল টিকাবীজ ১০০টি হাঁসকে প্রয়োগ করা যায়।
- মাপচোঙের সাহায্যে ১০০ মি.লি. পরিস্রুত পানি মেপে নিন।
- এবার মাপচোঙ থেকে ২ মি.লি. অথবা ৩ মি.লি. পরিস্রুত পানি সিরিঞ্জের সাহায্যে টিকার ভায়ালে ঢুকান।
- তারপর ভায়ালটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে শিশি থেকে টিকাবীজ সিরিঞ্জের সাহায্যে বের করুন।
- ভায়াল থেকে বের করা মিশ্রিত টিকাবীজ চোঙে মাপা বাকি পরিস্রুত পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
- এবার মাপচোঙ থেকে মিশ্রিত টিকাবীজ সিরিঞ্জে নিন।
- খাঁচা থেকে একটি একটি করে হাঁস বের করে ১ মি.লি. করে মাংসে ইনজেকশন দিয়ে ছেড়ে দিন।
- হাঁসের সংখ্যা বেশি হলে আবার আরেক ভায়াল টিকাবীজ একই নিয়মে গুলিয়ে নিন এবং একইভাবে প্রয়োগ করুন।

সুবিধা

স্বয়ংক্রিয় অটোমেটিক ভ্যাকসিনেশন গানের (Automatic Vaccination Gun) মাধ্যমে সমমাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করা যায় ।

অসুবিধা

এতে সময় বেশি লাগে ।

সাবধানতা

- সিরিঞ্জের সুচ যাতে হাঁসের পায়ের হাড়ে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- সিরিঞ্জের মধ্যে বাতাস ঢুকানো যাবে না ।

পাঠ ৬.৮ হাঁসমুরগির টিকার পরিচিতি ও সিডিউল খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসমুরগির প্রতিটি টিকা চিনে তা আলাদা করতে পারবেন।
- টিকা প্রদান সিডিউল খাতায় লিখতে পারবেন।

হাঁসমুরগিকে ব্যাকটেরিয়াল, মাইকোপ্লাজমাল ও ভাইরাল টিকা প্রদান করা হয়। এসব টিকার সবগুলোর গায়েই নাম লেখা থাকে না। অনেক টিকার রঙ দেখে চিনে নিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সাধারণত হাঁসমুরগিকে ব্যাকটেরিয়াল, মাইকোপ্লাজমাল এবং ভাইরাল টিকা প্রয়োগ করা হয়। এসব টিকার প্রত্যেকটির গায়েই নাম লেখা থাকে না। অনেক টিকাবীজ আছে, যেগুলোর রঙ দেখে চিনে নিতে হয়। তাই টিকাগুলো ভালোভাবে না চিনতে পারলে প্রয়োগের সময় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন টিকাবীজ চেনার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. **বি.সি.আর.ডি.ভি. ঃ** এটি বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকা। শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ট্যাবলেট আকারে কাঁচের ছোট ভায়ালে থাকে। এটির গায়ে নাম লেখা থাকে না। সবুজ বর্ণের ট্যাবলেট দেখে চিনতে হয়।

২. **আর.ডি.ভি. ঃ** এটি বড় মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকা। এটি শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ট্যাবলেট আকারে কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায়। ভায়ালের গায়ে কোনো নাম লেখা থাকে না। সাদা বর্ণের ট্যাবলেটই একমাত্র চেনার উপায়।

৩. **গামবোরো লাইভ টিকা ঃ** এটি মুরগির বাচ্চার গামবোরো রোগের টিকাবীজ। ট্যাবলেট আকারে শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় টিকাবীজটি কাঁচের ছোট ভায়ালে পাওয়া যায়। টিকাবীজের ভায়ালের গায়ে নাম লেখা থাকে। অনেক টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে টিকাবীজের সাথে ডাইলুয়েন্টের বোতল থাকে। ডাইলুয়েন্টের সাথে টিকাবীজ মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। ডাইলুয়েন্টকে অনেকেই ভুলবশত টিকাবীজ মনে করতে পারেন।

৪. **গামবোরো ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকা ঃ** এটি প্রজননকারী মোরগমুরগির জন্য গামবোরো রোগের টিকাবীজ। ৫০০ মি.লি. বোতলে তরল অবস্থায় এ টিকাবীজ পাওয়া যায়। বোতলের গায়ে নাম লেখা থাকে।

৫. **মারেক'স টিকা ঃ** এটি মুরগির মারেক'স রোগের টিকাবীজ। ট্যাবলেট আকারে শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে এ টিকাবীজ তৈরি করা থাকে। ভায়ালের গায়ে টিকাবীজের নাম লেখা থাকে। সাথে ২০০ মি.লি. বোতলে ডাইলুয়েন্ট থাকে যা দিয়ে টিকাবীজ গুলানো হয়। ডাইলুয়েন্টকে টিকাবীজ মনে করা যাবে না।

৬. **ফাউল পক্স ঃ** এটি মুরগির বসন্ত রোগের টিকাবীজ। এটি শুষ্ক হিমায়িত অবস্থায় ট্যাবলেট আকারে কাঁচের ছোট ভায়ালে থাকে। ভায়ালের গায়ে নাম লেখা থাকে না। লালচে বর্ণের ট্যাবলেট দেখে এ টিকাবীজ চিনতে হয়।

৭. **মাইকোপ্লাজমা ঃ** এটি মুরগির মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের টিকাবীজ। ৫০০ মি.লি. বোতলে তরল অবস্থায় এ টিকাবীজ তৈরি থাকে। বোতলের গায়ে নাম লেখা থাকে।

৮. **ফাউল কলেরা ঃ** এটি হাঁসমুরগির কলেরা রোগের টিকা। এ টিকা তরল অবস্থায় ১০০ মি.লি. কাঁচের বোতলে পাওয়া যায়। বোতলের গায়ে টিকার নাম লেখা থাকে।

৯. ডাক প্লেগ ঃ এটি হাঁসের ডাক প্লেগ রোগের টিকা। ট্যাবলেট আকারে তরল অবস্থায় কাঁচের ছোট ভায়ালে এ টিকা পাওয়া যায়। টিকার গায়ে নাম লেখা থাকে না। কাঁচের ভায়ালের ঢাকনার মধ্যে নীল রঙ দেয়া থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. হাঁসমুরগির বিভিন্ন টিকাবীজ, যেমন–
   ক. বি.সি.আর.ডি.ভি.
   খ. আর.ডি.ভি.
   গ. গামবোরো লাইভ
   ঘ. গামবোরো ইনঅ্যাকটিভেটেড
   ঙ. মারেক'স
   চ. ফাউল পক্স
   ছ. সালমোনেলা
   জ. মাইকোপ্লাজমা
   ঝ. ফাউল কলেরা
   ঞ. ডাক প্লেগ
২. থার্মোফ্লাক্স
৩. ফুটন্ত গরম পানি
৪. বরফের টুকরো
৫. ট্রে
৬. স্যাভলন অথবা ডেটল
৭. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- প্রথমে একটি জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন– স্যাভলন অথবা ডেটল দিয়ে হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।
- অতঃপর ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে থার্মোফ্লাক্স ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
- থার্মোফ্লাক্স পুরোপুরি ঠান্ডা করার পর কিছু বরফের টুকরো থার্মোফ্লাক্সের মধ্যে নিন।
- এবার সংরক্ষিত স্থান থেকে হাঁসমুরগির টিকাবীজগুলো থার্মোফ্লাক্সে নিয়ে মুখ বন্ধ করুন।
- তারপর একটা একটা করে থার্মোফ্লাক্স থেকে টিকা বের করে ট্রের মধ্যে রাখুন এবং চেনার বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে দেখে নিয়ে খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।
- এবার হাঁসমুরগির টিকার সিডিউল তৈরির জন্য খাতা ও কলম নিন। হাঁসমুরগির বয়সের কথা চিন্তা করে বয়সের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে টিকা প্রদান সিডিউল খাতায় লিখুন। সারণি ৪ এ সিডিউলের একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ৪ ঃ হাঁসমুরগির টিকার সিডিউল

বয়স	টিকার নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি	কোন্ রোগের জন্য
১ দিন	মারেক'স (মুরগি)	ঘাড়ের চামড়ার নিচে	মারেক'স
৭ দিন	বি.সি.আর.ডি.ভি. (মুরগি)	চোখে ফোটা	রাণীক্ষেত

বয়স	টিকার নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি	কোন্ রোগের জন্য
১৪–১৮ দিন	গামবোরো লাইভ (মুরগি)	চোখে ফোটা	গামবোরো
২১ দিন	বি.সি.আর.ডি.ভি. (মুরগি)	চোখে ফোটা	রাণীক্ষেত
৩০ দিন	ফাউল পক্স (মুরগি)	ডানার চামড়ার মধ্যে খোঁচা মেরে দিতে হয়	মুরগির বসন্ত
৬ ও ১৬ সপ্তাহ	সালমোনেলা লাইভ (মুরগি)	মাংসে ইনজেকশন	ফাউল টাইফয়েড
৬০ দিন এবং ৬ মাস পরপর	আর.ডি.ভি. (মুরগি)	মাংসে ইনজেকশন	রাণীক্ষেত
৯–১০ সপ্তাহ	মাইকোপ্লাজমা (মুরগি)	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	মাইকোপ্লাজমোসিস
৭৫ দিন, ৯০ দিন এবং ৬ মাস পরপর	ফাউল কলেরা (হাঁসমুরগি)	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	হাঁসমুরগির কলেরা
১৮–২০ সপ্তাহ	গামবোরো ইনঅ্যাকটিভেটেড (মুরগি)	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	গামবোরো
৩০ দিন, ৪৫ দিন এবং ৬ মাস পরপর	ডাক প্লেগ (হাঁস)	মাংসে ইনজেকশন	ডাক প্লেগ

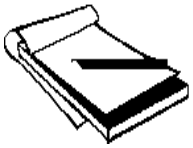

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। টিকা কী? কীভাবে টিকাবীজ সংরক্ষণ করবেন?

২। টিকাবীজের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণগুলো কী কী?

৩। টিকাবীজ পরিবহণের সময় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

৪। ব্যাকটেরিয়াল ও ভাইরাল টিকা বলতে কী বোঝেন? কয়েকটি ব্যাকটেরিয়াল ও ভাইরাল টিকার নাম লিখুন?

৫। মাইকোপ্লজমার টিকাবীজের নাম কী? কোন্ বয়সে, কী মাত্রায় এ টিকা মুরগিতে প্রয়োগ করতে হয়?

৬। কলেরা টিকা সম্পর্কে লিখুন।

৭। গামবোরো রোগ প্রতিরোধের জন্য কী কী টিকা রয়েছে? যে কোনো একটি টিকা সম্পর্কে লিখুন।

৮। কীভাবে পাখিতে বসন্তের টিকা প্রয়োগ করবেন?

৯। বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ তাপমাত্রা লিখুন।

১০। বি.সি.আর.ডি.ভি. কী? মুরগিতে এ টিকা প্রয়োগের জন্য কী কী উপকরণের প্রয়োজন হবে?

উত্তরমালা – ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. প্রস্তুতকারী ৩। খ. ১–১.৫ ঘন্টা
৪। ক. জীবিত রেখে, মেরে বা নিষ্ক্রিয় করে ৪। খ. পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে

পাঠ ৬.২

১। ক. i ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. ৬ ও ১৬ সপ্তাহ বয়সে ৩। খ. *Pasteurella*
৪। ক. নবিলিস এফসি ইন্যাক ৪। খ. *Mycoplasma gallisepticum* কে নিষ্ক্রিয় করে তৈরি করা হয়

পাঠ ৬.৩

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. ইনঅ্যাকটিভেটেড ৩। খ. ৬
৪। ক. ৭ দিন বয়সে ৪। খ. ২–৮° সে.

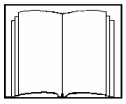

তথ্যসূত্র

দাস, প্র. (১৯৯৪)। *হাঁস-মুরগি পালন ও চিকিৎসা*, পশ্চিম বাংলা রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ভারত।

মোস্তাফা, এ. এইচ. এম. (১৯৯৪)। *খামারে হাঁস-মুরগি পালন ও রোগব্যাধির চিকিৎসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহমান, আ. (১৯৮৫)। *মুরগি ও অন্যান্য পাখির রোগতত্ত্ব (প্রথম খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান, আ. (১৯৮৫)। *মুরগি ও অন্যান্য পাখির রোগতত্ত্ব (দ্বিতীয় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান, আ. ন. ম. আ. (১৯৯৬)। *কোয়েল পালন*, পড়ুয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহমান, আ. ন. ম. আ. (১৯৯৭)। *শহরে পোল্ট্রি পালন*, রোদ্দুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সামাদ, এম. এ. (১৯৯৩)। *পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা*, লিরিক-এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ।

Anon. *Important Poultry Diseases,* Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands.

Anon (1976). *Vitamin Compendium,* Roche, Switzerland.

Banerjee, G. C. (1989). *A Textbook of Animal Husbandry (6th Ed.),* Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., India.

Batty, J. (1981). *Poultry Keeping,* Saiga Publishing Co. Ltd., Surrey, UK.

Coutts, G. S. (1981). *Poultry Diseases Under Modern Management,* Siaga Publishing Co. Ltd., Surrey UK.

FAO (1994). *A Manual on the Primary Animal Health Care Worker,* FAO Rome, Italy.

Jordan, F. T. W. (1990). *Poultry Diseases (3rd Ed.),* ELBS/Bailliere Tindall, UK.

North, M. O. (1968). *Commercial Chicken Production Manual (2nd Ed.),* AVI Publishing, Westport, Coun.

Rahman, M. H., Ahmed, S. and Mondal, M. M. H. (1996). *Introduction to Helminth Parasites of Animals and Birds of Bangladesh,* Dhaka, Bangladesh.

Singh, K. S. (1992). *Poultry Nutrition (3rd Ed.),* Kayani Publishers, Ludhiana, India.

Soulsby, E. J. L. (1986). *Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals (7th Ed.),* ELBS/Bailiere Tindall, UK.

তথ্যসূত্র

দাস, প্র. (১৯৯৪)। *হাঁস-মুরগি পালন ও চিকিৎসা*, পশ্চিম বাংলা রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ভারত।

মোস্তাফা, এ. এইচ. এম. (১৯৯৪)। *খামারে হাঁস-মুরগি পালন ও রোগব্যাধির চিকিৎসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহমান, আ. (১৯৮৫)। *মুরগি ও অন্যান্য পাখির রোগতত্ত্ব (প্রথম খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান, আ. (১৯৮৫)। *মুরগি ও অন্যান্য পাখির রোগতত্ত্ব (দ্বিতীয় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান, আ. ন. ম. আ. (১৯৯৬)। *কোয়েল পালন*, পড়ুয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহমান, আ. ন. ম. আ. (১৯৯৭)। *শহরে পোল্ট্রি পালন*, রোদ্দুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সামাদ, এম. এ. (১৯৯৩)। *পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা*, লিরিক-এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ।

Anon. *Important Poultry Diseases*, Intervet International B.V., Boxmeer, The Netherlands.

Anon (1976). *Vitamin Compendium*, Roche, Switzerland.

Banerjee, G. C. (1989). *A Textbook of Animal Husbandry (6th Ed.)*, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., India.

Batty, J. (1981). *Poultry Keeping*, Saiga Publishing Co. Ltd., Surrey, UK.

Coutts, G. S. (1981). *Poultry Diseases Under Modern Management*, Siaga Publishing Co. Ltd., Surrey UK.

FAO (1994). *A Manual on the Primary Animal Health Care Worker*, FAO Rome, Italy.

Jordan, F. T. W. (1990). *Poultry Diseases (3rd Ed.)*, ELBS/Bailliere Tindall, UK.

North, M. O. (1968). *Commercial Chicken Production Manual (2nd Ed.)*, AVI Publishing, Westport, Coun.

Rahman, M. H., Ahmed, S. and Mondal, M. M. H. (1996). *Introduction to Helminth Parasites of Animals and Birds of Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh.

Singh, K. S. (1992). *Poultry Nutrition (3rd Ed.)*, Kayani Publishers, Ludhiana, India.

Soulsby, E. J. L. (1986). *Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals (7th Ed.)*, ELBS/Bailiere Tindall, UK.

CLP 1206

পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ
POULTRY DISEASES & PREVENTION

সিএলপি ১২০৬

'পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ' সিএলপি প্রোগ্রামের একটি কোর্সবই। এ কোর্সবইটি দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্সবইটির বিভিন্ন ইউনিটে পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব, পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত রোগ, পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ, পোল্ট্রির পরজীবীজনিত রোগ, পোল্ট্রির অপুষ্টিজনিত ও অন্যান্য রোগ ও পোল্ট্রির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ISBN: 984-34-5056-6

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY